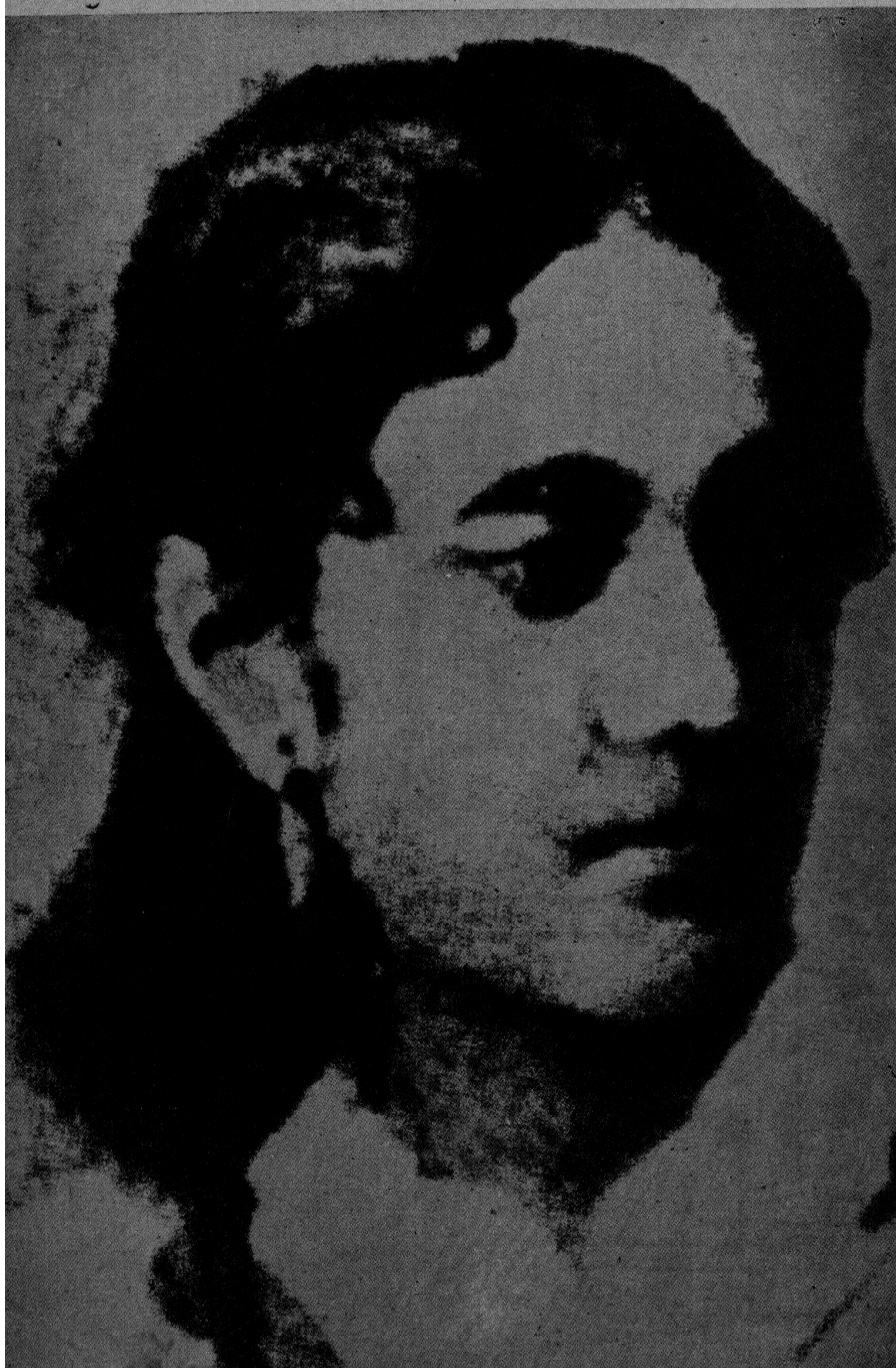


# কাদম্বরী দেবী

# কাদম্বরী দেবী

সুব্রত রুদ্র



আশা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৭

প্রকাশক : শীলা ভট্টাচার্য। আশা প্রকাশনী। ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড।
কলকাতা-৭০০ ০০৯।

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ। মুদ্রাকর প্রেস। ১০/১সি মারহাট্টা ডিচ লেন।
কলকাতা-৭০০ ০০৩।

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

উৎসর্গ

কাদম্বরী দেবী

## সূচীপত্র

চিত্রসূচী

# জী ব ন ক থা

কুশারীবংশের জয়রাম ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তান গোবিন্দরাম ঠাকুর। এঁর সঙ্গে বিবাহ হয় খুলনার দক্ষিণডিহী গ্রামের নন্দরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে রামপ্রিয়া দেবীর। গোবিন্দরামের মৃত্যুর পর রামপ্রিয়া দেবী তাঁর বিষয়আশয় গোবিন্দরামের অগ্রজদের কাছ থেকে আলাদা করে নেন সুপ্রিমকোর্টে গিয়ে। রামপ্রিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্মোহনকে প্রতিপালন করতে শুরু করেন, তাঁকে কলকাতার হাড়কাটা অঞ্চলে একখানা বাড়ি করে দেন। তিনি জগন্মোহনের বিবাহ দেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মামা কেনারাম রায়চৌধুরীর মেয়ে শিরোমণির সঙ্গে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে রামপ্রিয়ার সম্পর্ক আগেই ছিলো, কুশারীবংশের পঞ্চানন ঠাকুর ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদেরও আদিপুরুষ। এবার আবার নতুন করে একটা যোগাযোগ ঘটলো। ভোজনরসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জগন্মোহনের সংগীতপ্রীতি ছিলো অসাধারণ, সংগীতের একজন যথার্থ সমজদার ব্যক্তি হিসেবে সেকালে তাঁর নামডাক হয়েছিলো। জগন্মোহনের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় রসিকলালের দুই মেয়ের বিবাহ হয় দ্বারকানাথের ভাগ্নে আর দাদার পৌত্রের সঙ্গে। ঠনঠনের শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন জগন্মোহনের চতুর্থ সন্তান শ্যামলাল। তাঁর চার মেয়ের তৃতীয়া হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী, রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান।

শ্যামলালের নিবাস ছিলো কলকাতাতেই। কাদম্বরী জন্মান ১২৬৬ সালের ২১ আষাঢ়, ১৮৫৯-এর ৪ জুলাই। তাঁর ওপরে দুই বোন—বরদা আর মনোরমা। পরের বোন শ্বেতাম্বরী। মহর্ষি যখন ঠাকুর পরিবারের গৃহলক্ষ্মী করে তাঁকে নিয়ে আসেন তখন কাদম্বরীর বয়স ন' বছর। তিনি সুন্দরী ছিলেন অবশ্যই, তবে শ্যামবর্ণা। মহর্ষির পুত্রবধূরা সকলেই শ্যামবর্ণা ছিলেন। আশ্চর্যরকম সুন্দর ছিলো কাদম্বরীর চোখ আর চুল। ইন্দিরা দেবী নতুন কাকিমার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তাঁর বড় বড় চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল····।'[১] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নতুন বৌঠানের 'চোখ দুটো এমনভাবে তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই ঐ চোখ দুটো তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে।'[২] অনায়াসে আকৃষ্ট করবার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিলো তাঁর।

মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সিবিল সার্ভিস পাশ করে বিলেত থেকে ফেরেন ১৮৬৪ সালে। দেশে ফিরে তিনি কয়েক বছরের ব্যবধানে পরিবারের আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। বিলেতেই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন হয়ে উঠেছিলো স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্তন করা। স্বর্ণকুমারী দেবী সে সময়ের কথায় বলেছেন, 'তখন অন্তঃপুরের অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ-বাড়ি হইতে ও-বাড়ি যাইতে হইলে ঘেরাটোপ মোড়া পালকির সঙ্গে প্রহরী ছোটে····।'[৩] মহর্ষির কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কর্মস্থান বম্বে নিয়ে গেলেন, সেই প্রথম ঠাকুরবাড়ির বধূর অন্তঃপুর ছেড়ে বেরুনো। তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদা-নন্দিনী এ সম্পর্কে স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'কর্তামশায় আমাকে বম্বে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলে, আমাকে ঐ পোশাক পরিয়ে ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্‌কি করে জাহাজে তুলে দেওয়া হল।····সে সময়ে আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে তো বাইরে যাওয়া যায় না।

তাই উনি কোনো ফরাসী দোকানে ফরমাস দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্য করালেন,—বোধ হয় তাদের মতে ওরিয়েন্টাল যাকে বলে।'[৫] তার দু'বছর পর জ্ঞানদানন্দিনী যখন বাড়ির সদরের সামনে গাড়ি থেকে নামলেন, ঘরের বউ-এর মেমের মতো অভিনব আচরণ দেখে পরিবারের মেয়েরা মেলামেশা করতে ভয় করছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন তখনো পুরাতনপন্থী। এসব ঘটনারও কয়েক বছর পর মেয়েদের স্বাধীনতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' বেরোয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার আগ্রহী, তাঁর উৎসাহ ছিলো লেখাপড়া জানা কোন সাবালিকার সঙ্গে ভাই-এর বিবাহ দেন, তাছাড়া তখনই বিবাহ হয় এ ইচ্ছেও ছিলো না, চেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত যান। তিনি তখন বম্বে প্রবাসে, ৮ জুন ১৮৬৮ আহম্মদনগর থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখছেন, 'নতুনের ( অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ) বিবাহের আর বিলম্ব নাই—শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে, আমি যদি নতুন হইতাম তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না। কোন্ হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না। নতুনের কি মত—তিনি সন্তুষ্ট হইলেই হইল। এই বিবাহের পর বোধ করি নতুনের আর বিলাত যাইবার ইচ্ছে থাকিবে না'।[৬] তিনি অনুমান করেছিলেন একবার সংসারী হয়ে পড়লে বিদেশ যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তিনদিন পর আবার লিখছেন, 'তুমি লিখিতেছ নূতন হয়তো একজন মনের মতন লোক পাইয়া চিরজীবন সুখে থাকিতে পারেন—তেমন হইলেও পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার বোধ হয় তাহার বিপরীত হওয়া অধিক সম্ভব এবং সেরূপ হইলে মনে করো দেখি কতদূর পরিতাপের বিষয়।'[৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ ঠিক করে মহর্ষি সত্যেন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, 'এক তো পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহের যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার

ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমাদিগকে ভয় করে।'[৭] এ ব্যাপারে সেকালে ঠাকুরবাড়ির একঘরে অবস্থা ছিলো; কাদম্বরীর পাঁচজন নন্দাইদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাস করতেন। জামাইরা কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, কেউ হয়তো কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন, সুন্দর চেহারা দেখে পিরালীর লোকেরা ধরে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে পিরালী পরিবারে বিয়ে করায়।[৮]

শেষ পর্যন্ত ২৩ আষাঢ়, ১২৭৫ (৫ জুলাই, ১৮৬৮) মহর্ষির ষষ্ঠ সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরীর বিবাহ হলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স সে সময় উনিশ বছর। তিনি ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা আর দেননি। ১৮৬৭ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'নবনাটক' অভিনীত হয়। নটীর ভূমিকায় অভিনয় করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বিবাহের দু'মাস আগে হিন্দুমেলার অধিবেশনের জন্যে স্বদেশী কবিতা রচনা করেন; সেজদা হেমেন্দ্রনাথ মেলায় সেই কবিতা পাঠ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরীর বিবাহ হয়ে যাবার সাতদিন পর আবার সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন স্ত্রীকে, 'শ্যামবাবুর মেয়ে মনে করিয়া আমার মনে হয় না যে ভাল মেয়ে হইবে—কোন অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না।'[৯] কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিলেত যাওয়া হয় নি সে অন্য কারণে, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা তৈরি হয়ে গেছে, নাটকের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। আর কাদম্বরী, যিনি ঠাকুরপরিবারের গৃহবধূ হিসেবে কোনো অংশেই যে অনুপযুক্তা হননি আমরা পরে তা দেখতে পেয়েছি।

জোড়াসাঁকো বাড়ির বাইরে তেতালার অর্ধেকটা হলো নতুন বৌ-এর। অর্ধেকটায় পরে এসেছিলেন স্বর্ণকুমারী। নতুন বৌ এসেই ছাদে বাগান করে তুললেন, চামেলি, গন্ধরাজ, করবী, রজনীগন্ধা, দোলনচাঁপা, আর পিল্পের ওপরে সারি সারি জাম গাছের টব

বসালেন। সংগীতের সঙ্গে তাঁদের পৈতৃক যোগ বরাবরের নিবিড়। ঠাকুরদার মতো সংগীতে তাঁরও দখল ছিলো, ওপরের ঘরে পিয়ানো এসে গেল। পশ্চিমের বারান্দায় নানা জাতের পাখির জায়গা হলো, তাদের ভিতর চীনদেশের একটি শ্যামাও রাখলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবনী প্রণেতা মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন, গৃহ-সজ্জার প্রতি কাদম্বরী দেবীর প্রখর দৃষ্টি থাকতো, নিখুঁতভাবে তিনি সাজাতেন সবকিছু, বাগান আর নানারকম গাছের ছিলো সখ। সন্ধের সময় এই ছাদের বাগানে শুরু হতো গান বাজনা। নাম দিয়েছিলেন 'নন্দনকানন'। এখানে আসতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী সংগীত-রসিক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ইনি একাধারে গায়ক, লেখক, সাহিত্যে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ অনুরাগ ছিলো। তিনি উদার শিল্পরসিক ছিলেন। এঁর স্ত্রী লেখিকা শরৎকুমারী, তিনিও আসতেন সন্ধেবেলা। নিজে রান্না করে কাদম্বরী দেবী তেতালার ছাদে পরি-বেশন করতেন সবাইকে। তাঁর হাতের রান্না রবীন্দ্রনাথের কাছে একেবারে অমৃত। তিনি বলেছেন 'বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন।' এই খাওয়ানোর সখ মেটাতে রবীন্দ্রনাথকে পেতেন কাছে। স্কুল থেকে ফিরে বৌঠাকরুনের হাতে মাখা পানতা ভাতের সঙ্গে একটু লঙ্কা দিয়ে চিংড়ির চচ্চড়ি যদি পেতেন, সেদিন আর কথা থাকতো না। তাই বাড়ি এসে কোনদিন নতুন বৌঠানকে না পেলে একেবারে মন-মরা হয়ে পড়তেন। পৈতের সময় কাদম্বরী হবিষ্যান্ন রেঁধে দিয়েছিলেন দু'ভাইকে, রবীন্দ্রনাথ সেই তিনদিনের খাওয়ার স্বাদ ভুলতে পারেননি কখনো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে জমিদারী দেখাশোনার ভার পান। দুপুরে যেতেন কাছারিতে। যেখানে তাঁর জন্য রুপোর রেকাবিতে ফল মিষ্টি পাঠানো হতো। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু-কিছু থাকতো তার সঙ্গে, আর

তার উপরে ছড়ানো হতো গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকতো ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা।"[১০]

ঠাকুর পরিবারের অন্তঃপুরে এবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে নতুন রীতি সাবেক দিনের চলতি সংস্কারকে উড়িয়ে দিলে। তিনি কাদম্বরীকে ঘোড়ায় চড়া শেখালেন, দুজনে দুটি আরব ঘোড়ায় পাশাপাশি গড়ের মাঠে রোজ বেড়াতে চললেন। ময়দানে সবেগে দুজনে ঘোড়া ছোটাতেন। রাস্তার লোক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো সে সময়!

একদিন তেতালার ঘরে বসে পরামর্শ করা হলো মাসিক পত্রিকা বের করবেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়বাবু এঁরা রইলেন। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ কাগজের নাম দিলেন 'ভারতী'। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে মাঝে মাঝে আসতেন প্রবীণ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, ইনিও 'ভারতীর' সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক 'সরোজিনী' প্রকাশের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন এঁদের সংগীত, সাহিত্যচর্চায়। কাদম্বরীর চেয়ে তিন বছরে বড়ো ননদ স্বর্ণকুমারীও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চলে এলেন স্বামীর বিলেত যাবার কিছু আগেই। সে সময়ের পরিচয় পাওয়া যাবে স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবীর স্মৃতিকথায়, 'প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা মহাশয়ের ছেলেমেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাত্নী, দাসদাসীতে বাড়ি ভরা। সে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারজন বামুন ঠাকুর ভোর থেকে রান্না চড়ায়।....ঘরে ঘরে বামুন ঠাকুরেরা যে খাবার দিয়ে যেত সেটা হল সরকারী রান্নাঘরের যোগান, এর উপরে প্রতি-মহলে তোলা উনুনে গিন্নীদের নিজের নিজের রুচি ও স্বামীর ফরমাশ অনুযায়ী বেসরকারী বিশিষ্ট রান্না আলাদা হতো।'[১১] সে সময়ে চা-কফির রেওয়াজ ছিলো না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন নিয়মিত। কাদম্বরীর নিত্য নতুন রান্নার সখ তো ছিলোই।

সকাল সাতটায় দালানে ঘণ্টা বাজতো উপাসনায় বসবার। বাড়ির মেয়ে বউরা বিবাহের পাওয়া চেলি পরে সেখানে যেতেন। উপাসনা শেষে আবার যে যার অন্য পোশাকে ভাঁড়ারে আসতেন। ভাঁড়ার ঘরের বৈঠকটি জমজমাট। তরকারি কোটার সঙ্গে সেখানে গল্পগুজব চলতো। সরলা দেবী লিখছেন, 'এই তরকারি কোটার আসরে বড় মাসিমা, সেজ মাসিমা ও ছোট মাসিমা, বড় মামী নতুন মামী (কাদম্বরী) ও ন-মাসী এবং সরোজা দিদি (বড় মামার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠ কন্যা) ও সুশীলা দিদি (সেজ মাসিমার জ্যেষ্ঠ কন্যা)—এই কজনের নিত্য উপস্থিতি দেখতে পেতুম।'[১২]

ভারতী নিয়মিত বেরুতে শুরু করলে প্রায় রবিবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ভারতীর ভাণ্ডার নিয়ে অক্ষয়বাবুর বাড়ি যেতেন। সেখান থেকে আলাপ পরামর্শ সেরে বিহারীলালের বাড়ি। কখনো জানকীবাবুর বাড়িতে বসতো তাঁদের আলাপ আলোচনা, সেখানেও সকলে মিলিত হতেন। 'ভারতী'র প্রাণ ছিলেন কাদম্বরী, তাঁকে পত্রিকাগোষ্ঠীর মধ্যমণি বলা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন, 'প্রায় সমবয়সী বলে তাঁদের বন্ধুতা গাঢ় ছিলো। কাদম্বরী সব সময়ে সাহিত্য আলোচনায় আনন্দ পেতেন।'[১৩] সন্ধে হলে প্রতিদিন বাড়িতে বসতে শুরু করলো সাহিত্যের আসর, আলোচনা, কবিতাপাঠ, গান। অক্ষয়বাবু হলেন ভারতীর সাহিত্য সমালোচক। তারক পালিত মহাশয় এলেন। সকালের দিকে আরেকটি বৈঠক বসতো, সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথের, তার চেহারা অন্য রকম।

এ সময়ে কাদম্বরী দেবীর জীবনে একটি বিশেষ শোকাবহ ঘটনা ঘটে। তিনি সন্তানহীনা, তাই স্বর্ণকুমারীর ছোটো মেয়ে উর্মিলাকে তিনি তেতালায় নিজের কাছে রেখে মানুষ করছিলেন। তাকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো সব কিছু নিজেই করতেন। সে সেখানেই বড়ো হচ্ছিল তাঁর মেয়ে হয়ে। একটু বড়ো হলে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলে যাবার ছমাস পরে একদিন তেতালার

ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে একা নামতে গিয়ে সে নীচে পড়ে মারা যায়। এ প্রসঙ্গে সরলা দেবী লিখছেন, 'উর্মিলা ছিল নতুন মামীর আদুরে। ....এত বড় প্রকাণ্ড বাড়িতে যেখানে বড়দের সবই চলছে —আমোদ-প্রমোদ ও স্নেহ-ভালবাসা অন্য ছেলেমেয়েদের জন্যে— সেখানে নতুন মামী ছোট বোন উর্মিলাকে যেমন ভালবাসতেন, তাকে যেমন বুকে করে নিয়েছিলেন, আমাকে যদি তেমনি কেউ স্নেহ দিয়ে ঘিরত। ....নিঃসন্তান নতুন মামীর মেয়ে যেন সে।'[১৩] বোঝা যায় কী ভয়ংকর শোক কাদম্বরী পেয়েছিলেন তাঁর মেয়েটির মৃত্যুতে। বাড়ির ছোটোরা সামান্য অসুস্থ হলেই তিনি তাঁদের নিয়ে থাকতেন সর্বদা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত।'[১৪] বুঝতে ভুল হয় না এই অসামান্যা গুণের মহিলা কেন রবীন্দ্রনাথের এত প্রাণের গভীরে ছিলেন।

ধারাবাহিক ভাবে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' যখন বেরুচ্ছে কাগজে, তিনি নিয়মিত পড়তেন। তাঁর খুবই প্রিয় ছিলো বিহারী-লালের রচনা। মুখস্থ বলতে পারতেন। তিনি বিহারীলালকে নিমন্ত্রণ করে নিজে খাওয়াতেন। নিজে হাতে বুনে একখানি সুন্দর কাজ করা আসন উপহার দিয়েছিলেন, তাতে বিহারীলালের রচনাই কয়েক ছত্র তোলা ছিলো কবির কাছে তাঁর প্রশ্ন হিসেবে। সেই প্রশ্নের মধ্যে কিছুটা কৌতুকও আছে নিশ্চয়ই! 'ভারতী' যে বছর প্রথম বেরোয় সেই বছরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'এমন কর্ম আর করবো না' অভিনীত হয়েছিলো ঘরোয়া পরিবেশে জোড়াসাঁকোয়।

কাদম্বরী দেবী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই তাঁর প্রথম অভিনয় মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে যে 'শ্রীমতী হে—' কে বইটি উৎসর্গ করেছিলেন, তা হলো এই হেমাঙ্গিনীর 'হে'। এ অনুমান সজনীকান্ত দাসের। ইন্দিরা

দেবীর কাছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শোনা 'হেকেটি' থেকে 'হে'। হেকেটির আড়ালে কাদম্বরী। হেকেটি একজন গ্রীক দেবী। রবীন্দ্রনাথের 'মালতী পুঁথি' বা ওই ধরনের পুঁথিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেখেছিলেন 'হেকেটি' শব্দ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত যাবার সময় কাদম্বরী দেবীর বয়স উনিশ। রবীন্দ্রনাথ চলে যাবার পরেই নন্দনকানন একেবারে শূন্য হয়ে উঠেছিলো। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নাটকরচনা নিয়ে ছিলেন কিছুদিন, তারপর অসুস্থতার জন্য সস্ত্রীক দীর্ঘকাল ষ্টিমারে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসবার পরই আবার শুরু হলো নাটক অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে দেখলেন মানময়ী গীতিনাট্য শেষ হয়েছে। তিনি 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি' শেষ দিকে এই গানখানি জুড়লেন। 'মানময়ী'তে কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়েছিলেন ইন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ মদনের ভূমিকায়। এর আগেই স্বর্ণকুমারীর লেখা বসন্ত-উৎসবে কাদম্বরী লীলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ দুভাবে তলোয়ার ঘুরিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন নাটকে।

হাওয়া বদল করতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী প্রায়ই যেতেন গঙ্গাতীরে। চন্দননগর শহরের কোণে একটা ছোট দোতালা বাড়িতে তাঁরা উঠেছিলেন বারকয়েক। এবার উঠলেন মোরান সাহেবের বিখ্যাত বাগান বাড়িতে। বাড়িটা রাজবাড়ি বিশেষ, জানলা রঙিন কাঁচে তৈরি, মেঝে মার্বেল পাথরে মোড়া। সোজা গঙ্গার পার থেকে সিঁড়ি লম্বা বারান্দা পর্যন্ত। সব চেয়ে উঁচুতে ছিলো গোলাকার একটা ঘর যার চারদিকই খোলা। রবীন্দ্রনাথ এসে প্রায় একবছর এখানে কাটিয়েছিলেন নতুন বৌঠান ও জ্যোতিদাদার সঙ্গে। সন্ধ্যাসংগীতের শেষ পর্বের কবিতাগুলো তাঁর এখানেই রচনা। এ সময়ে বহু গল্প রচনাও করেছিলেন। চন্দননগরের স্মৃতি জড়ানো দিনগুলির কথা মনে রেখে কাদম্বরী দেবীকেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' উৎসর্গ করেছেন।

'আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল—এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।' চন্দননগর থেকে ফিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সস্ত্রীক সদর স্ট্রীটের একখানা বাড়ি ভাড়া করেন। এখানে কিছুদিন তাঁরা বাস করবার পর দার্জিলিং যান বেড়াতে। সেখান থেকে ফিরে আবার সার্কুলার রোডে একখানা বাড়িতে উঠলেন। পরের বছর সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কারোয়ারে বেড়াতে গেলেন। কাদম্বরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। এই সমুদ্র বন্দরে বেড়ানোই কাদম্বরীর শেষ বেড়াতে যাওয়া। কারোয়ার থেকে ফিরলেন সকলে সত্যেন্দ্রনাথের বাগান বাড়ি ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোডে।

প্রায় সমবয়সিনী এই বৌদি যে রবীন্দ্রনাথের কত আপন ও অন্তরঙ্গ ছিলেন, তা আমরা দেখতে পাবো পরবর্তী উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথেরই রচনায়। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবন আচ্ছন্ন করেছিলেন তিনি। দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে গ্রন্থপাঠ, বৃষ্টির মধ্যে বারান্দায় বসে দু'জনের মিলিত গান—এই রকম অজস্র মধুর দৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কাদম্বরী দেবী অমর।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথায় জানতে পারি, 'ছেলেবেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ ছিল রবিকাকার কনে দেখতে যশোহর যাওয়া। কন্যাযাত্রীর মধ্যে (একরকম ঘুরিয়ে আমাদের ঐ নাম দেওয়া যেতে পারে) বড়রা ছিলেন মা, জ্যোতিকাকামশায়, নতুন কাকিমা, রবিকাকা; ছোটদের মধ্যে আমরা দুই ভাইবোন কাউ।'[১৩] অনেক অনুসন্ধানের পর যশোরের মেয়ে ভবতারিণীর সঙ্গে বিবাহের ঠিক হলো (পরে ভবতারিণী নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী)। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়ে গেল ১২৯০ অগ্রহায়ণে। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের চারমাস পর কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন ১২৯১ বৈশাখ

মাসের ৮ তারিখে ( ১৯ এপ্রিল :৮৮৪ )। কারণটা সঠিক আজো জানা যায়নি। তবে একথা জানা গিয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিলো। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু বিষয়ে পারিবারিক বন্ধু বিহারীলালও দোষারোপ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে। মৃত্যুর বাসনা সম্ভবত তাঁর মনে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এসেছিলো। এমন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তিনি এর আগেও এই চেষ্টা নিয়েছিলেন অন্যভাবে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুমান কাদম্বরী দেবীর প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অমনোযোগের কারণ হয়তো কাদম্বরীর নিঃসন্তানতা। এই জন্যই জ্ঞানদানন্দিনী এবং তাঁর ছেলেমেয়ের সাহচর্য তিনি পছন্দ করতেন। একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তিনি রবীন্দ্রজীবনীতে। স্টীমারে একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী ও তাঁর ছেলেমেয়েরা বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধের মধ্যে ফেরবার কথা ছিলো। তাঁরা সময়মতো ফিরতে পারেননি, স্টীমার চরে আটকে যাওয়ায়। এইটেই ছিলো কাদম্বরী দেবীর অভিমানের কারণ।[১৭]

রবীন্দ্রনাথের ছোট দিদি বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে অমল হোম জেনেছিলেন আর এক ঘটনা। কাজী আবদুল ওদুদ 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন। '....জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেই দিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক কতকগুলো চিঠি পাওয়া যায়, এই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী দেবী ক'দিন বিমনা হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলোই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এই কথা নাকি কাদম্বরী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়।' কাজী আবদুল ওদুদ এও লিখেছেন যে তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছিলেন, যে-মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল

তিনি অভিনেত্রী নন তবে সেই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী না কি আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের বিবাহের আগে। কাজী আবদুল ওদুদ আরো লিখেছেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন 'যতদূর জানা আছে তাহা (কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু) মহিলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণাম।'[১৮]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'তারকা হইতেছেন কাদম্বরী দেবী। এই কাদম্বরী দেবী তাঁর শেষ জীবনাহুতি দানের পূর্বে আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতার উৎস সেইখানে অনুসন্ধনীয়।'[১৯] এ তথ্য অবশ্য ঠিক নয়। কাদম্বরী দেবী মৃত্যুর আগে আরো একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে থাকতে পারেন কিন্তু 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে রচিত হয়নি। কবিতাটির পটভূমিতে যে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা নেই, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার বলেছিলেন: "দায়িত্বহীন কর্মহীন দিনগুলি। তখনও বিবাহ হয় নাই। "গান আরম্ভ"—কবিতা এখানেই লেখা। সেইরূপে বিনা-কষ্টের কষ্ট—অনির্দিষ্ট বেদনা, তারকার আত্মহত্যা।'[২০] কোনো কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি চলছিলো, তিনি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর নতুন বৌঠানকে অতি ঘনিষ্টভাবে পেয়েছিলেন, সেইরকম নতুন বৌঠানের স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর এক বৌদির সান্নিধ্য খুব পছন্দ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। আগেই আমরা দেখেছি, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাইয়ের বিবাহ অনুমোদন করেন নি। পরবর্তীকালেও যে সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী নতুন বৌ কাদম্বরীকে সুনজরে দেখেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে যাতায়াত করতেন নিয়মিত। স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ঐ বৌদি, বৌদির শিশুসন্তান ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সরোজিনী জাহাজে চেপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এও লক্ষনীয় যে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর বিবাহ করেন নি। কেন করেন নি এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'তাঁকে ভালোবাসি।'[২১]

অবনীন্দ্রনাথের বোন সুনয়নী দেবী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু বর্ণনায় বলেছেন, 'সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে এক কাপড়উলী প্রায়ই কাপড় বেচতে আসতো। তার নাম ছিল বোধ হয় বিশু। তাকে টাকা দিয়ে তিনি লুকিয়ে আফিম আনান—তাই খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আমরা এ বাড়ির জানলা দিয়ে দেখছি। ঘরে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে।'[২২] এই মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন নিদারুণ শোক। কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের পায়ের নীচ থেকে পৃথিবী সরে গেল।

আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী বলেন, 'নতুন কাকিমা জেদী মেয়ে ছিলেন। একদিন জ্যোতিকাকামহাশয়কে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো। জ্যোতিকাকামশাই প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না। তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল বিরাজিতলাওয়ে আমাদের বাড়ি। আমার মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল। সেদিনও যথারীতি সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে এসেছেন জ্যোতিকাকামশাই। আড্ডায় আড্ডায়, গানে গানে এমন দেরি হয়ে গেল, সে রাত্রে আর জোড়াসাঁকো ফিরলেন না। পরদিন যখন বাড়ি ফিরলেন, নতুন কাকিমার মুখ থমথমে—কথাই বললেন না। তার অভিমান হল প্রচণ্ড, জন্মদিনে বলা সত্ত্বেও কেন জ্যোতিকাকামশাই এলেন না।*

---

* এখানে এই জন্মদিনের উল্লেখ নিয়ে একটু খটকা আছে। কাদম্বরীর জন্ম আষাঢ় মাসে। তিনি আত্মহত্যা করেন বৈশাখে। সেক্ষেত্রে, 'তার দুদিন পরেই অঘটন' কীভাবে সম্ভব?

তার দুদিন পরেই অঘটন। আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে এক কাপড়ওয়ালা আসত, তার নাম বিশু। সেই বিশুকে দিয়ে নতুন কাকিমা লুকিয়ে আফিম আনালেন। সেই আফিম খেয়েই নতুন কাকিমার সব শেষ।'[২৩] বাড়িতে পুলিশ এসে কাদম্বরী দেবীর দেহ নিয়ে যায়। মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম করতে পাঠানো হয়। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে ছিলো, পাকস্থলীতে আফিমের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু।

## সূত্র-পঞ্জী

১ নাট্যস্মৃতি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। 'রবীন্দ্রস্মৃতি'। পৃ ২৫।

২ 'নতুন বৌঠানের চোখ দুটো এমন ভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জলজল করতে থাকে—কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখেরই আদল এসে যায়।' মানুষের প্রতিকৃতি। মনোরঞ্জন গুপ্ত। 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' প্রথম সংস্করণ ১৯৪৯। পৃ ৩২।

৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ। পুলিনবিহারী সেন। 'পুরাতনী'। পৃ ১৯৬-১৯৭।

৪ স্মৃতিকথা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'পুরাতনী'। পৃ ২৯।

৫ স্ত্রীর প্রতি পত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পুরাতনী'। পৃ ৭৩-৭৪।

৬ তদেব। পৃ ৮৫।

৭ তদেব। পৃ ১২৬।

৮ স্মৃতিকথা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'পুরাতনী'। পৃ ২০।

৯ স্ত্রীর প্রতি পত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পুরাতনী'। পৃ ১০৬।

১০ ছেলেবেলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ছেলেবেলা'। পৃ ৬৮।

১১ জীবনের ঝরাপাতা। সরলা দেবী। 'জীবনের ঝরাপাতা'। পৃ ৯-১০।

১২ তদেব। পৃ ১১।

১৩ পত্নীবিয়োগ। মন্মথনাথ ঘোষ। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'। পৃ ১৩৬।

১৪ জীবনের ঝরাপাতা। সরলা দেবী। 'জীবনের ঝরাপাতা'। পৃ ২১।

১৫ ছেলেবেলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ছেলেবেলা'। পৃ ৭১।

১৬ স্মৃতিকথা ২। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। 'মৃণালিনী দেবী'। পৃ ১৯।

১৭ শোক ও সান্ত্বনা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক'। পৃ ১৯৭।

১৮ নতুন বৌঠাকরুনের তিরোধান। কাজী আবদুল ওদুদ। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রথম খণ্ড। পৃ ৭৩।

১৯ সন্ধ্যাসংগীতের পর্ব : ১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'। পৃ ১১৯।

২০ ১৩১৮ সালের ১৪ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। এই বৈঠকে অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখেরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'সন্ধ্যাসংগীত' বিষয়ে কথাবার্তা শোনেন। ক্ষিতিমোহন সেন সেই আলোচনার অনুলিখন রাখেন। ১৩৮৩ শারদীয় আনন্দবাজারে তার অংশ 'জীবনস্মৃতির জন্মকথা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

২১ গৃহজীবনে। মৈত্রেয়ী দেবী। 'রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে'। পৃ ১১-১২।

২২ আত্মবিসর্জন। জগদীশ ভট্টাচার্য। 'কবিমানসী'। পৃ ২৭৬।

২৩ নতুন দাদা। অমিতাভ চৌধুরী। 'অন্য রবীন্দ্রনাথ'। পৃ ৩৫-৩৬।

# রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গপত্র

# ভগ্নহৃদয়

## উপহার

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল এ আঁখি-'পরে ঢালো গো আলোকধারা
ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও-মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি এ ভগ্নহৃদয়খানি,
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

ভগ্নহৃদয়

উপহার

শ্রীমতী হে............................

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়।
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়।

২

জীবনসমুদ্রে তব জীবনতটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়তো জানো না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাকো তাহারি অটল বলে—
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে।

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে,
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে।
দিবস ফুরাবে যবে    সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—
ফুরাইবে গীতগান,    অবসাদে ম্রিয়মাণ,
সুখশান্তি অবসান—কাঁদিব আঁধারে বসি।

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায়    সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিয়ো দান।
আজিকে বিদায় তবে,    আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান!

## সন্ধ্যাসংগীত

### উপহার

ভুলে গেছি কবে তুমি    ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময়    সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে    শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—

চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শক্তিময় পূরবীরাগিণী তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

বলো দেখি কতদিন
আসনি এ শূন্য প্রাণে।
বলো দেখি কতদিন
চাওনি হৃদয়পানে,
বলো দেখি কতদিন
শোননি এ মোর গান—
তবে সখী গান-গাওয়া
হল বুঝি অবসান।

যে রাগ শিখায়েছিলে   সে কি আমি গেছি ভুলে
তার সাথে মিলিছে না সুর ?
তাই কি আস না প্রাণে   তাই কি শোন না গান
তাই সখী, রয়েছ কি দূর ?
ভালো সখী, আবার শিখাও,
আরবার মুখপানে চাও,
একবার ফেলো অশ্রুজল
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি।
তা হলে পুরোনো সুর   আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি।

সেই পুরাতন চোখে   মাঝে মাঝে চেয়ো সখী,
উছলিয়া স্মৃতির মন্দির।
এই পুরাতন প্রাণে   মাঝে মাঝে এসো সখী,
শূন্য আছে প্রাণের কুটির।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

## ছবি ও গান

### উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তের মালা গাঁথিলাম।

যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি
একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত,
তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

বিবিধ প্রসঙ্গ
সমাপন

'—এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুই জনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখদুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক এক দিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল—এক লেখা তুমি আমি পড়িব। আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।'

## ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

### উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

## শৈশবসংগীত

### উপহার

এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকে শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

## প্রকৃতির প্রতিশোধ

### উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

# রবীন্দ্রনাথের রচনা ও স্মৃতি

১২৯১

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
ও মা, ফিরে আয়!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
ও মা ফিরে আয়!
সন্ধে হয়ে এল, আমার গৃহ অন্ধকার,
মাগো, প্রদীপ জ্বলে না!
সবাই ফিরে এল ঘরে একে একে গো
আমায়—মা ত কেউ বলে না

ঐ সময় হ'য়ে এল যে মা বেঁধে দেব চুল
তোরে পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি!
বাছার সেই মুখ্‌খানি তোর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে
চাঁদ মুখের শুনব ছুটি বাণী!

কি খেলা খেলালি আজ মা,
অনাদর কে তোরে করেছে,
চোখের জলে চলে গেলি রে,
মলিন মুখ মনে পড়েছে !
সেই বড় বড় আঁখি ছুখানি,
রৈলি যখন মুখের পানে তুলে,
বড় স্নেহে গেলি তাদের কাছে
তবু তারা নিলে না কি কোলে !
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেই-খানে তুই আয় রে বাছা আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া !

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
তারি গাছে এত ফুল ফুটেছে
একটি সে ত পর্‌তে পেল না !
সে ফুলগুলি তোরা পরিস্‌ কেন ?
সে বুঝি বা পর্‌বে ফিরে এসে !
ও-গুলি সব কুড়িয়ে রেখে দিই,
দেখা হলে পরাব তার কেশে !

সন্ধ্যাবেলায় শূন্য কোলে ব'সে—
এখন কি মা ছেড়ে থাকতে আছে !
আঁধার হল, সবাই ঘরে এল
ফিরে আয় মা, ফিরে আয় মা কাছে !

হেথা হতে যাও, পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

সুনীল আকাশ 'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখিরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।

সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে,
শুনিছে পাতার মরমর।

কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারিপাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই তো ভুলে আছে কেহ হাসে কেহ নাচে,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।

বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস,
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।

উঠেছে প্রভাত-রবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।
বারেক যে চলে যায়, তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া।

তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়।
কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন।
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন।
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

১২৯১

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা!
ও—আমার ঘুমিয়ে পড়েছে;—
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা
কান্না দেখে কান্না পাবে যে!

ওর— ফুরিয়েছিল সাধের খেলাধূলা,
ওর— বুকের মাঝে ছিল পাষাণ ভার,—

ও কেঁদে কেঁদে আজ ঘুমোলো
ওরে তোরা কাঁদাস্ নে আর।

ওর— বুকফাটা স্বর শুনিস্ নি কি তোরা?
অসহায় প্রাণের বেদনা
চাঁদের পানে দেখ্‌ত শুধু চেয়ে,
কোথাও কি ওর ছিলরে সান্ত্বনা।
সবার পরে ছিল ভালবাসা,
কোথায় পাবি এত কোমল স্নেহ,
সবার তরে কান্না পেত ওর—
ওর তরে কি কেঁদেছিলি কেহ।

যে গাছে ও জল দিত রে
কাঁটা তারি ফুটে যেত পায়—
তবু কি ও কথাটি বলেছে,
ওর চোখের ভাষা কে বুঝিত হায়।
আহা আজ ঘুমিয়ে পড়েছে,
এমন ঘুম বুঝি ঘুমোত না,
রাতে বুঝি হৃদয় নিয়ে তার
খেলাইত অশান্ত বেদনা।
কত রাত গিয়েছে এমন
বয়েছেরে বসন্তের বায়,
পূবের জানালা দিয়ে ধীরে
চাঁদের আলো পড়েছে ওর গায়।
কত রাত গিয়েছে এমন
দূর হতে বাজিতরে বাঁশি।

সুরগুলি কেঁদে কেঁদে ফিরে
বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছে এমন
কোলেতে বকুল ফুল রাশ,
নতমুখে উলটি পালটি
চেয়ে চেয়ে ফেলেছে নিশ্বাস !

সে সব রজনী পোহাল রে,
ফুরাল রে হৃদয়-বেদনা,
এখন তবে ঘুমোক্ আরামে,
বাছা আর কেঁদনা কেঁদনা !

১২৯২ বৈশাখ

## প্রভাতে

সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে ? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল ? এ দিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে ? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে ! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ, সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে ? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ? সেখানে তো মা আছে—তাহারা কি তাহাদের ছোটো ছোটো শিশুগুলিকে চাঁদের আলোতে শুয়াইয়া, মুখের পানে চাহিয়া চুমো খাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে ? কতশত সেখানে কুটির গাছপালার মধ্যে,

নদীর ধারে, পর্বতের উপত্যকায়, মাঠের পাশে, অরণ্যের প্রান্তে আপনার স্নেহ প্রেম সুখ দুঃখ বুকের মধ্যে লইয়া সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছে! সেখানে আমাদের কোন্ অজ্ঞাত একটি পাখি এই সময়ে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে; সেখানকার লোকের প্রাণের সুখদুঃখের সহিত প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এই পাখির গান মিশিয়া যায়। তাহাদের দেশে যে-সকল কবিরা বহুকাল পূর্বে বাস করিত, যাহারা আর নাই, লোকে যাহাদের গান জানে কিন্তু নাম জানে না, তাহারাও কোন্ সন্ধ্যাবেলায় কোন্-এক নদীর ধারে ঘাসের 'পরে শুইয়া এই পাখির গান শুনিত ও গান গাহিত! সে হয়তো আজ বহুদিনের কথা—কিন্তু তখনকার প্রেমিকেরাও তো সহসা এই পাখির স্বর শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বিরহীরা এই পাখির গান শুনিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিশ্বাস ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহারা তাহাদের সে-সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যখন জীবনের খেলা খেলিত, ঠিক আমাদের মতো করিয়াই খেলিত, এমনি করিয়াই কাঁদিত; তাহারা ছায়া ছিল না, মায়া ছিল না, কাহিনী ছিল না। তাহাদের গায়েও বাতাস ঠিক এমনি জীবন্ত ভাবেই লাগিত—তাহারা তাহাদের বাগান হইতে ফুল তুলিত; তাহারা এক কালে বালক বালিকা ছিল—যখন মা-বাপের কোলে বসিয়া হাসিত তখন মনে হইত না তাহারাও বড়ো হইবে। কিন্তু তবুও তাহারা আজিকার এই চারি দিকের জীবময় লোকারণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া একেবারে 'নাই' হইয়া গেল! বাগানে এই-যে বহুবৃদ্ধ বকুলগাছটি দেখিতেছি—একদিন কোন্ সকালবেলায় কী সাধ করিয়া কে একজন ইহা রোপণ করিতেছিল—সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি যখন ফুল সংগ্রহ করিতেছি তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি! হায় হায়, সে যদি আসিয়া দেখে, সে যাহাদিগকে

যত্ন করিত, সে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাহার নাম করে না, তাহারা আর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না—যেন তাহারা আপনিই হইয়াছে, আপনিই আছে, এমনি ভান করে—যেন তাহাদের সহিত কাহারও যোগ ছিল না।

....

কিন্তু এই বুঝি এ জগতের নিয়ম। আর, এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে। যতদিন কাজ করিবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। ততদিন ফুল তোমার জন্যই ফুটে, আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তোমার জন্যই আলো ধরিয়া থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে তোমারই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে—তোমাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়—তোমাকে এই জগৎ-দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয়। খরতর কাল-স্রোতের মধ্যে তোমাকে খড়কুটার মতো ঝাঁটাইয়া ফেলে, তুমি হুহু করিয়া ভাসিয়া যাও, দিন দুই বাদে তোমার আর একেবারে নাগাল পাওয়া যায় না। এমন না হইলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করিয়া থাকিত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকিত না। কারণ মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। এত মৃত অধিবাসীর জন্য আমাদের হৃদয়েও স্থান নাই। কাজেই অকর্মণ্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি জগৎ হইতে আমাদিগকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালোবাসার এই পুরস্কার। কিন্তু পুরস্কার পাইবে কে বলিয়াছিল! এই তো চিরদিন হইয়া আসিতেছিল, এই তো চিরদিন হইবে!—তাই যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই—তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা হয়তো আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়তো আমাকে চাহিতেছে। এক কালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার

রাজ্য ছিল—কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে। কেহ তাহাদের চিহ্ন রাখিতে চাহিতেছে না। আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক! বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে—যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে—যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালোবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে, এই জগতের মধ্যাহ্ন কিরণে কি তাহার সেই ভালোবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না—কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!

....

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পারো, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে

আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই। এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?

....

আমরা যাহাদের ভালোবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্নারাত্রির একটা অর্থ আছে—বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতরো দেখিতে হইয়াছে, নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত! তাই যখন একজন প্রিয়ব্যক্তি চলিয়া যায় তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়—মনে আশ্চর্য বোধ হয়, তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না! যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না! জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালোবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালোবাসার চারি দিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কী মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে, প্রভাতে চারি দিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্যসাগরেও তাহারই এক তালে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে—কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান! কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না। অনেক দিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল। একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না।

যে গেছে, সে সমস্ত জগৎ হইতে তাহার লাবণ্যচ্ছায়া তুলিয়া লইয়া গেছে।

যখন আমাদের প্রিয়বিয়োগ হয় তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, অথচ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে; যেমন নিতান্ত কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা দেখিলে আমাদের সহসা সন্দেহ হয় আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি, আমাদের হাতের কাছে যে-জিনিস থাকে তাহা ভালো করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখি এ-সমস্ত সত্য কিনা; তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলিয়া যায় তখন আমরা জগৎকে চারি দিকে স্পর্শ করিয়া দেখি—ইহারাও সব ছায়া কিনা, মায়া কিনা, ইহারাও এখনি চারি দিক হইতে মিলাইয়া যাইবে কিনা। কিন্তু যখন দেখি ইহারা অচল রহিয়াছে তখন জগৎকে যেন তুলনায় আরও দ্বিগুণ কঠিন বলিয়া মনে হয়। দেখিতে পাই যে, তখন যে-ফুলেরা বলিত 'সে না থাকিলে ফুটিব না', যে-জ্যোৎস্না বলিত 'সে না থাকিলে উঠিব না', তাহারাও আজ ঠিক তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, তেমনি করিয়াই উঠিতেছে। তাহারা তখন যতখানি সত্য ছিল, এখনও ঠিক ততখানি সত্যই আছে—এক চুলও ইতস্তত হয় নাই।—এইজন্য সে যে নাই, এই কথাটাই অত্যন্ত বেশি করিয়া মনে হয়, কারণ, সে ছাড়া আর-সমস্তই অতিশয় আছে।

...

আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না। এক-একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এই-জন্য আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ, সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার

যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত;—আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম। সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধূলা, সতেরো বৎসরের সুখ দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর-কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর কোনো সম্বন্ধই রহিল না—সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল,—এ জন্মের মতো আমার হৃদয়-কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।

আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে! আবার তো কত নূতন ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্কই থাকিবে না! কত নূতন সুখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো হাসিবেন না—কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো কাঁদিবেন না। কত শত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক-মুহূর্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়—তাঁহারও কত নূতন সুখ দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোনো যোগ নাই! যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা

অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়েই নিতান্ত আপনার লোক!

....

কোথায় নহবৎ বসিয়াছে! সকাল হইতে না হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কী উৎসবময় বলিয়া মনে হইত। বাঁশিতে কেবল আনন্দের কণ্ঠস্বরটুকু মাত্র দূর হইতে শুনিতে পাইতাম, বাকিটুকু কী মোহময় আকারে কল্পনায় উদিত হইত! কত সুখ, কত হাসি, কত হাস্যপরিহাস, কত মধুময় লজ্জা, আত্মীয়-পরিজনের আনন্দ—আপনার লোকদের সঙ্গে কত সুখের সম্বন্ধে জড়িত হওয়া, ভালোবাসার লোকের মুখের দিকে চাওয়া, ছেলেদের কোলে করা, পরিহাসের লোকদের সহিত স্নেহময় মধুর পরিহাস করা, এমন কত কী দৃশ্য সূর্যালোকে চোখের সমুখে দেখিতাম! এখন আর তাহা হয় না! আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের এক জায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবলই মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয় সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়। তখন আর বাঁশি বাজে না! বাপমায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়—একদিন সকালে মধুর সূর্যের আলোতে তাহার বিবাহেও বাঁশি বাজিয়াছিল। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, মনে কোনো দুঃখ ছিল না, কিছুই সে জানিত না! বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারি দিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে, সেই ছোটো মেয়েটি গলায় হার পরিয়া, পায়ে দুগাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল। অল্প বয়সে খুব বৃহৎ খেলা খেলিতে যেরূপ আনন্দ হয় তাহার সেইরূপ আনন্দ হইতেছিল। কে জানিত সে কী খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল! সেদিনও প্রভাত এমনি মধুর ছিল!

দেখিতে দেখিতে কত লোক তাহার নিতান্ত আত্মীয় হইল, তাহার প্রাণের খুব কাছাকাছি বাস করিতে লাগিল, পরের সুখ দুঃখ লইয়া সে নিজের সুখ দুঃখ রচনা করিতে লাগিল। সে তাহার কোমল হৃদয়খানি লইয়া দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিত, কোমল হাত দুখানি লইয়া রোগের সময় সেবা করিত। সেদিন বাঁশি বাজাইয়া আসিল, সে আজ গেল কী করিয়া! সে কেন চোখের জল ফেলিল! সে তাহার গভীর হৃদয়ের অতৃপ্তি, তাহার আজন্মকালের দুরাশা, শ্মশানের চিতার মধ্যে বিসর্জন দিয়া গেল কোথায়! সে কেন বালিকাই রহিল না, তাহার ভাইবোনদের সঙ্গে চিরদিন খেলা করিল না! সে আপনার সাধের জিনিস সকল ফেলিয়া আপনার ঘর ছাড়িয়া, আপনার বড়ো ভালোবাসার লোকদের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়া—যে কোলে ছেলেরা খেলা করিত, সেই স্নেহ-মাখানো কোল, সেই কোমল হাত, সেই সুন্দর দেহ সত্য সত্যই একেবারে ছাই করিয়া চলিয়া গেল!

কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল! এমন রোজই কোনো-না-কোনো জায়গায় বাঁশি তো বাজিতেছেই। কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া, কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে—অথচ একটি কথা বলিতেছে না, কেবল চোখে তাহাদের কাতরতা, এবং হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। সবই যে দুঃখের তাহা নয়, কিন্তু সকলেরই তো পরিণাম আছে। পরিণামের অর্থ—উৎসবের প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া, বিসর্জনের পর মর্মভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলা। পরিণামের অর্থ—সূর্যালোক এক মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ম্লান হইয়া যাওয়া-সহসা জগতের চারি দিক সুখহীন, শান্তিহীন, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন মরুভূমি হইয়া যাওয়া! পরিণামের অর্থ—হৃদয়ের মধ্যে কিছুতেই বলিতেছে না যে, সমস্তই শেষ হইয়া

গেছে, অথচ চারি দিকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া; প্রতি মুহূর্তে প্রতি নূতন ঘটনায় অতি প্রচণ্ড আঘাতে নূতন করিয়া অনুভব করা যে, আর হইবে না, আর ফিরিবে না, আর নয়, আর কিছুতেই নয়! সেই অতি নিষ্ঠুর কঠিন বজ্রপাষাণময় 'নয়'—নামক প্রকাণ্ড লৌহদ্বারের সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে একতিল উদ্‌ঘাটিত হয় না!

....

মানুষে মানুষে চিরদিনের মিলন যে কী গুরুতর ব্যাপার তাহা সহসা সকলের মনে হয় না। তাহা চিরদিনের বিচ্ছেদের চেয়ে বেশি গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্ধভাবে জগতের চারি দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, কে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানকার নয় সে হয়তো সেইখানেই রহিয়া গেল! এ জীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাহা বাসস্থান হওয়া উচিত ছিল তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়াইল। আমরা সচেতন জড়পিণ্ডের মতো অহর্নিশি যে গড়াইয়া চলিতেছি—আমরা কি জানিতে পারিতেছি পদে পদে কত হৃদয়ের কত স্থান মাড়াইয়া চলিতেছি, আশে-পাশের কত আশা কত সুখ দলন করিয়া চলিতেছি! সকল সময়ে তাহাদের বিলাপটুকুও শুনিতে পাই না, শুনিলেও সকল সময়ে অনুভব করতে পারি না। সারাদিন আঘাত তো করিতেছিই, আঘাত তো সহিতেছিই, কিছুতেই বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ, আমরা পরস্পরকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না—দেখিতে পাই না—কোন্‌খানে যে কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলাম জানিতেই পারি না। আমরা শৈলশিখরচ্যুত পাষাণখণ্ডের মতো। আমাদের পথে পড়িয়া দুর্ভাগা ফুল পিষ্ট হইতেছে, লতা ছিন্ন হইতেছে, তৃণ শুষ্ক হইতেছে—আবার, হয়তো আমরা কাহার সুখের কুটিরের উপর অভিশাপের মতো পড়িয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিতেছি। ইহার কোনো উপায় দেখা যায় না। সকলেরই কিছু-না-কিছু ভার আছেই, সকলেই জগৎকে কিছু-না-কিছু পীড়া

দেয়ই। যতক্ষণ তাহারা দৈবক্রমে তাহাদের ভারসহনক্ষম স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকে ততক্ষণ সমস্ত কুশল, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহারা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছায় যেখানে তাহাদের ভার আর সয় না! যাহার উপর পা দেয় সেও ভাঙিয়া যায়, আর অনেক সময় যে পা দেয় সেও পড়িয়া যায়।....

....

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন-কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে-সকল বিশ্বাস তাহার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায়! নিষ্ঠুর তর্কদিগের ভয়ে যে প্রিয় বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত আজ অনায়াসে তাহাদিগকে তর্কে বিতর্কে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে। প্রিয়বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে, "এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ওই খানিকটা ভস্ম! কখনোই নহে!" তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে, "আশ্চর্য কি! তেমন সুন্দর মুখখানি—কোমলতায় সৌন্দর্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি—সেও যে আর কিছু নয়, দুইমুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে, এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত। বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস কী!" এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজের নৌকাডুবি করিয়া আর কূলকিনারা দেখিতে চায় না। তাহার খানিকটা গিয়াছে বলিয়া সে আর বাকি কিছুই রাখিতে চায় না। সে বলে, তাহার সঙ্গে সমস্তটাই যাক্। কিন্তু সমস্তটা তো যায় না, আমরা নিজেই বাকি থাকি যে! তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মতো নিরাশ্রয় করিয়া ফেলি। হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরো বেশী করিয়া ধরি না কেন। এ সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনোই এত ভয়ানক ও এত

নিষ্ঠুর হইতেই পারে না। সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আমাকে আশ্রয় দিবেই! যেখানেই হউক এক জায়গায় কিনারা আছেই, তা সে সমুদ্রের তলেই হউক আর সমুদ্রের পারেই হউক— মরিয়াই হউক আর বাঁচিয়াই হউক। মিছামিছি আর তো ভাবা যায় না।

....

তুমি বলিতেছ, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছে। আমাদিগকে কেবল ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। কাজ হইয়া গেলেই সে আমাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এত বড় যাহার কারখানা, যাহার রাজ্যে এমন বিশাল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে, সে কি সত্য সত্যই এই কোটি কোটি অসহায় জীবকে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে! সে কি এই সমস্ত সংসারের তাপে তাপিত, অহর্নিশি কার্যতৎপর, দুঃখে ভাবনায় ভারাক্রান্ত, দীনহীন গলদঘর্ম প্রাণীদিগকে মেকি টাকায় মাহিয়ানা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে! সে টাকা কি কোথাও ভাঙাইতে পারা যাইবে না! এখানে না-হয় আর কোথাও? এমন ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও হীন প্রবঞ্চনা কি এত বড়ো মহত্ত্ব ও এত বড়ো স্থায়িত্বের সহিত মিশ খায়! কেবলমাত্র ফাঁকির জাল গাঁথিয়া গাঁথিয়া কি এমনতরো অসীম ব্যাপার নির্মিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র আশ্বাসে আজন্মকাল কাজ করিয়া যদি অবশেষে হৃদয়ের শীতবস্ত্রটুকুও পৃথিবীতে ফেলিয়া পুরস্কারস্বরূপ কেবলমাত্র অতৃপ্তি ও অশ্রুজল লইয়া সকলকেই মরণের মহামেরুর মধ্যে নির্বাসিত হইতে হয়, তবে এই অভিশপ্ত রাক্ষস সংসার নিজের পাপসাগরে নিজে কোন্ কালে ডুবিয়া মরিত। কারণ, প্রকৃতির মধ্যেই ঋণ এবং পরিশোধের নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কেহই এক কড়ার ঋণ রাখিয়া যাইতে পারে না, তাহার সুদসুদ্ধ শুধিয়া যাইতে হয়—এমন-কি, পিতার ঋণ পিতামহের ঋণ পর্যন্ত শুধিতে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। এমন স্থলে প্রকৃতি যে

চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য জীবের দেনদার হইয়া থাকিবে এমন সম্ভব বোধ হয় না, তাহা হইলে সে নিজের নিয়মেই নিজে মারা পড়িত।

....

তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপন করিয়াছিলে তাহাকে কি আর তোমার মনে আছে। তুমি যখন ছিলে তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে, বুঝি তাহারই পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে. "তুমি এসো তোমাকে রোজ ফুল দিব!" হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভালো করিয়া দেখিতে পায় না—আর যখন সে শূন্যহৃদয়ে চলিয়া যায়, এ-জন্মের মতো দেখা ফুরাইয়া যায়, তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কী হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালোবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্য দ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি—কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর সকলেই ইচ্ছা করিলে এই ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে—কেবল তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না!

....

তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে, তখন যে তোমাকে দেখিতে পাই না, তাহাতে তেমন আশ্চর্য নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্তি তখনও যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের সময় তুমি নাই, বিপদের সময় তুমি নাই, রোগের সময় তুমি নাই! তোমার দ্বারে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে—হৃদয়ে সরল প্রীতির সহিত

তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসিতে বলে না। তুমি যাহাকে বড়ো ভালোবাসিতে সেই ছোটো মেয়েটি যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে—তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে। এখন আর কে কাহাকে দেখিবে! যে অযাচিত প্রীতি-স্নেহ-সান্ত্বনায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল—এখন কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড তাহারই পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

যাহারা ভালো, যাহারা ভালো বাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে, সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মতো, বীণার মতো—তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়—তাহাদের বিলাপধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলে না! তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে না 'আহা'! —তখন কেন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। হে ঈশ্বর, এমন যন্ত্রটিকে লুকাইয়া রাখ না কেন—ইহাকে আজিও সংসারের হাটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন—তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও—পাষণ্ড নরাধম পাষাণহৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্ ঝন্ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে—খেলাচ্ছলে তাহার প্রাণের সংগীত শুনিয়া তার পরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না—তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে—এইজন্য কখনো বা উপহাস করিয়া, কখনো বা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া, এই সুমধুর

সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে— সংগীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়।

....

কেহ কারো মন বোঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি—
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না আর কথা হইবে না—
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায়—হায়॥

১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে, তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে।

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না, সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনো হয় সেই পবিত্র স্থানে ভয় আর আসিতে পারে না।

দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ ঘরের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান

হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে; পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মতো খেলা করে। এই জীবন মৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোনো ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু, রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে এক তালে নৃত্য করে, যেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে; সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে। কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এইজন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন। হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন। তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও; জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ

হইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্দরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পরের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কিনা কে বলিতে পারে। পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না। এ ঘর কী ভাবে চাহে, কী ভাবে শোনে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে-সকল স্নেহপ্রেমের লীলা হইয়া গেছে সেই স্নেহপ্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে; এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসারক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিও না, দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া, মানুষের সাড়া পাইয়া, চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু, পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত

করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

১৩১৩ শ্রাবণ/১৯ জুলাই ১৯০৬

আমার নিজের মাথার পাকা চুল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় আপনারাও যদি আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আমার কি উপায় হবে। যদি স্নেহ করেন তো বাঁচি—তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম—তাঁকে হারানর পর আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান হয়েছি।

১৩১৮ ভাদ্র/১৩১৯ শ্রাবণ

....বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।

ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলোবাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলোবাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না—মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। ....তাহার পরে

গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, 'এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও।'—তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দু'ই মনে বড়ো বাজিত। তারপরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে সার্শির পাল্লার মধ্য দিয়া সাজানো দেখিতে পাইতাম, কাঁচের এবং চীনামাটির কত দুর্লভ সামগ্রী—তার কত রং এবং কত সজ্জা! আমরা কোনোদিন তাহা স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিলাম না—কখনো তাহা চাহিতেও সাহস করিতাম না। কিন্তু এইসকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিসগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরও কেমন রঙিন করিয়া তুলিত।....

....

....সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত, তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া বহন করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।....

....সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্য-চর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত, আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার

সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই, এই রকমের কিছু-একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

....এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্য-দর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরানী এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল! কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজ-হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।....

..প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনে সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরেরা বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না;—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।

...বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির

একটা প্রধান অঙ্গ ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না।

....কিন্তু আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।

....জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না ; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন-সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল—এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, একি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!....

....সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে,

কিছুদিন এ-দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি! আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

....বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজা পতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।....

১৩২১ অগ্রহায়ণ

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধাতার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়,
এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব

কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হল কত কাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছি জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ পাথারে ;
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে

চলিয়াছি দূর হতে দূরে—
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।

তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল।
ভুলি নে কি তারা।
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

১৩২৪ আষাঢ়/২২ জুন ১৯১৭

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি মনে খুব বেদনা বোধ করচি। তার কারণ, এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে! আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুকে জানলার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের রথ চলেচে, মানুষের ইতিহাসের রথ চলেচে—বাধাবিঘ্ন বিপদসম্পদের মধ্যে দিয়ে সে আপনার গতিবেগে আপনার পথ কাটচে—সেই পথই সৃষ্টির পথ। আমার জীবাত্মার যে যাত্রা সেও অমনিতর বিরাট,—সেও ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে আপনাকে এবং আপনার পথকে সৃষ্টি করচে—লোকে লোকান্তরে, যুগে যুগান্তরে কোনো শোকদুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাক্‌ব না। আমরা সৃষ্টিকর্তা—আমরা অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করব, কোনো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখবে না। এই কথা মনে রেখে যাত্রীর গান ধর—বিশ্বযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে নিরাসক্ত চিত্তে চিরজীবনের পথে অবাধে

চলে যাও। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেছে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক। নিজেকে তুমি দীন বলে অপমানিত কোরো না, বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক।

১৩২৬ আষাঢ়

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?"

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালাম। বললেম, "মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।"

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে!

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।"

সে বললে, "এই দেখো-না আমার গলার হার।"

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, "আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।"

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লজ্জিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তারপরে কখন ভুলে গেলাম।"

সে বললে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও!"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম; "এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

১৩২৬ কার্তিক

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি—সবই তো সত্য।"

মন বললে, "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, থামো তুমি। ঐ দেখো-না গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশী মায়া হল কেন।"

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বললেন, "যা ভালো তা সত্য, তা

কখনো যায় না ; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে বললেম, "কী করে জানলে। দেহ কি ভালো নয়! সে দেহ গেল কোন্‌খানে।"

ছোটো ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

১৩২৬ কার্তিক

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি ; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা ; তারই সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়া ; সতেরো বছর ধরে এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ; কখনো আদরে কখনো

অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে বসবে কে।"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, "আমরা খুঁজতে বেরোলেম।"

"কাকে।"

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এদিকে, কখনো যায় ওদিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

১৩৩৬ কার্তিক-অগ্রহায়ণ/প্ল্যানচেট

১৯২৯ সাল ৪ নভেম্বর।

কে?

—নাম জিজ্ঞাসা কোরো না। তুমি যা ভাবছ, আমি তাই।

১৯২৯ সাল ২৮ নভেম্বর।

কে?

—এখন তো সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু এখন তো আসব না জানো। না, এখন কাজ নেই।

১৯১৯ সাল ২৯ নভেম্বর।

কে? কী নাম?

—আমি একটি কথা বলে চলে যাব। জানি কিছুকাল তোমার কাছে আসা সম্ভব হবে না।....

আমার কাছে আসার দরুন কোনো ক্ষতি হয়েছে তোমার এখন?

—না, আমি বুঝতে পারছি না যে, আমি কার ভিতর দিয়ে আসব।

ঐখানে যে মিডিয়াম আছে, তাকে অবলম্বন করে তো আসতে পারো।

—তিনি যদি না থাকেন?

তিনি থাকবেন না, তা তো জানি।

—সেই কথাই বলছি।

হাঁ, অনেকদিন হয়ত পাব না। আবার কলকাতায় যখন ডাকব, তখন আসবে?

—বেশ, যাই।

কে? কী নাম?

—যাইনি।

ভালো। তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তা কয়েছি, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হয়নি?

—না, ভাল লেগেছে।

কাল রাতে কি এসেছিলে?

—বলব না।

কাল রাতে কি কাছে এসেছিলে?

—কথা বলব কী করে?

হয়ত এসেছিলে আমার মনে হয়। মিডিয়াম না থাকলে আসতে পার না? এখানে আর কোনো মিডিয়াম আছে বলতে পার?

—না, কেমন করে বলব, ঠিক কে যে ডেকে নেয়, তা তো আগে থেকে বোঝা যায় না। তুমি মুশকিলে পড়েছ, আমি যাই।

১৯২৯ সাল ২৯ নভেম্বর। রাত।

কে?

—কূলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলুম, আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।

তুমি নাম বলবে না?

—না।

একটা কবিতা লিখে দেবে?

—আমার বিদ্যে কি অজানা?

আমি তোমার কথা শান্তিনিকেতনে অনেকবার ভেবেছিলুম। আমার শরীর ভাল ছিল না। তখন তোমায় ভেবেছি। তুমি জানতে?

—জানি। আমি আসতে পারিনি। মনে মনে এসেছিলুম। কেমন করে বা বোঝাব।

আমি তোমাদের কিছু বুঝতে পারিনে। কী করে আস, কী করে যাও, কী করে থাক—কিছু বুঝতে পারিনে।

—শেষ রাত্রে শিরশিরে হাওয়ায় তুমি যখন গায়ের কাপড়টা টেনে নিলে, আমি এসেছিলুম তখন।

আমি তোমাকে মনে মনে বলেছিলুম একদিন যে, আমার অসুখ করেছে। তুমি যদি এসে থাক, আমায় একটু সেবা করে যাও।

—তুমি চাও, কিন্তু ভাল করে দেবার মতো শক্তি তো আমার নেই। তাই বড় অভাব বোধ হয়। তোমাকে কী মুশকিলে ফেলেছি।

কিছু মুশকিলে ফেলনি। তোমার এখন যে রূপ আছে, সে কি আগের মতো—তোমায় আমরা যেমন দেখেছিলুম?

—শমীর ভাষায় বলা যায়, কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো, কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।

তোমরা পরস্পরকে দেখ যে, জানো যে, সেটা কেমন করে হয়?

— হাওয়ার কি রূপ নেই।

আমাদের কাছে তো হাওয়ার রূপ নেই।

—ভাব আছে, গতি আছে, বেগ আছে।

তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে কি ঐরকম প্রভেদ—যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার প্রভেদ?

—না না, অন্য রকম। বোঝানো যায় না। তুমি আমায় দেখলে ঠিক চিনবে। আমার ছায়াটা আজও আছে, প্রাণ আছে, দেহ নেই শুধু।

১৩৪১ শ্রাবণ

বাংলাদেশে বৌদি সম্পর্কটি বড়ো মধুর। এমনটি আর কোনো দেশে নেই। মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানের কথা—খুব ভালো-বাসতুম তাঁকে, তিনিও আমায় খুব ভালোবাসতেন। এই ভালো-বাসায় নতুন বৌঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন। আমার সকল আবদারের ঐ একটি স্থান ছিল—নতুন বৌঠান। কত আবদার করেছি, কত যত্ন ভালোবাসা পেয়েছি।

১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ

সে-বাড়িতে জ্যোতিদাদা নতুন বৌঠান আর আমি এলাম থাকতে। গঙ্গা সাঁতরে তখন এপার ওপার হতাম। নতুন বৌঠান দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। কত বেড়িয়েছি নতুন বৌঠান আর আমি বনে জঙ্গলে, কত কুল পেড়ে খেয়েছি। বিদ্যাপতির অনেকগুলি

গানে আমি সুর দিই সে সময়ে। 'এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—এ-গানে এখানেই সুর দিই। সুর দিয়েই নতুন বৌঠানকে শোনাতুম। খুব ভালোবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমায় খুব ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসায় নতুন বৌঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন।

মরে যে যায়, সে যায়ই। আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। শুনতাম, ডাকলে না কি আত্মা এসে দেখা দেয়। সে ভুল। নতুন বৌঠান মারা গেলেন, কী বেদনা বাজল বুকে। মনে আছে সে সময়ে আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেছি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছি, 'কোথায় তুমি নতুনবৌঠান, একবার এসে আমায় দেখা দাও!' কতদিন এমন হয়েছে—সারারাত এভাবে কেটেছে। সেই সময়ে আমি এই গানটাই গাইতুম বেশি, আমার বড়ো প্রিয় গান

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের এ বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

মজা এই, যে মরে যায় তার আর বয়স বাড়ে না। আমার নতুনবৌঠান—তিনি ঐটুকু মেয়েই রয়ে গেলেন। আর আমি কত বুড়ো হয়েছি, ঝুঁকে পড়েছি।

বৌমা, আমায় নতুনবৌঠানের একটি ফটো এনে দেখাও-না একবার।

১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

এই দেখ্ না কেন, আমাদের কালে যদি বৌঠানদের ইনস্টিটিউ-শানটা না থাকত, তবে কী উপায় হত আমাদের ভেবে দেখ্ দেখি।

আমাদের কালে অন্য মেয়েরা সব কোথায় ছিল। বাড়ির বাইরে কোনো মেয়েদের সঙ্গে মিশবার আমাদের উপায় ছিল না। মেয়ে বলে জানতুম ঐ বৌঠানদের। ভালোবাসা, মান, অভিমান দুষ্টুমি যা কিছু বল্, ঐ বৌঠানদের সঙ্গেই ছিল সব। মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানকে। মজা এই দেখ্ না কেন, যাঁরা মরে যায়, তাঁদের আর বয়স বাড়ে না। নতুন বৌঠান—তাঁর আর বয়স হল না কোনোদিন।

দুপুরবেলা নতুন বৌঠানকে ইংরেজি পড়াতুম, কত সময়ে কত উপদ্রব করেছি। তিনি হাসিমুখে সে-সব উপদ্রব মেনে নিতেন।

১৩৪৪ আষাঢ়

জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

....সেই যে তেতালার ছাদে নতুন বৌঠানের হাতের রান্না, সে মনে হত একেবারে অমৃত। তিনি সর্বদাই আমাকে খোঁচাতেন, সেটা যে স্নেহ তা তো বুঝতুম না তখন, লজ্জা পেতুম, দুঃখ হত। মনে হত কী করে এমন হব যে আর কোনো দোষ তিনি খুঁজে পাবেন না। সবাই খেতে বসেছি হঠাৎ তিনি বলতেন—'দেখ দেখ রবি কী রকম করে খায়, ঠিক ওনার মত করে।' কী লজ্জা পেতুম তখন। অথচ সেটা কম্প্লিমেণ্ট, ওনার মত করে খাওয়া খুবই বড় কম্প্লিমেণ্ট! 'রবি সব চেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভালো নয়, গলা যেন কী রকম। ও কোনোদিন গাইতে পারবে না, ওর চেয়ে সত্য ভালো গায়,

—অথচ এ সবই ছলনা, মনে মনে বলতেন তার উল্টো। তিনি তো কখনো স্বীকার করতেন না যে আমি লিখতে পারি, বা কোনো কালে পারব। বিহারীলাল ছিল তাঁর আদর্শ। শুধু একটি মাত্র গুণ আমার স্বীকার করতেন যে আমি ভাল সুপুরি কাটতে পারি। 'রবি কী চমৎকার সুপুরি কাটে'—ওটা অবশ্য কাজ আদায়ের ফন্দি; আচ্ছা, আজকাল তোমাদের সুপুরি কাটা উঠে গেছে? এখন যেমন দেখি পশম আর কাঠি নিয়ে তোমার হাত চলছেই, তখন তেমনি জাঁতি আর সুপুরি হাতে হাতে ঘুরত। যাক্, আমি তাঁর ইচ্ছেমতো সুপুরি কাটায় যথেষ্ট উন্নতি করতে পারলুম না! ইস্কুল থেকে ফিরে যদি দেখতুম তিনি বাড়ি নেই, ভারি দুঃখ হত। তিনি বলতেন, বাঃ তোমার জন্য কি আমি আত্মীয়তা লৌকিকতা ছেড়ে দেব নাকি?.... খুব আবদার করেছি তাঁর কাছে। তার পরে শেষ হয়ে গেল সেই তেতালার ছাদের পালা।

১৩৪৬ আশ্বিন-কার্তিক

জীবনে কত জায়গা ঘুরেছি, কত মানুষের বিচিত্র আনাগোনা, কত আনন্দ উপহার,—কিন্তু প্রথম বয়সের সেই যে তেতালার ছাদের জীবন, বৌঠাকরুনের হাতের অমৃত—সে যেমন মনে পড়ে এমন আর কিছু নয়। আর কিছুই যেন জীবনের উপর সে রকম দাগ কাটেনি—বিশেষ করে যত দিন যাচ্ছে তত সেই দূরের দিনগুলো যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কাছাকাছি সব কিছু পেরিয়ে মন চলে যায় সেই জীবনের কেন্দ্রে,—লিখতে বসলে সেইখানেই মনটা ঘোরা ফেরা করে। 'ছড়া ও ছবি'তে আমার ছেলেবেলার কথা ছড়িয়ে আছে। আমাদের ভাইদের মধ্যে যেরকম সম্পর্ক ছিল আজকাল বোধ হয় এরকমটি হয় না,—বিশেষ করে জ্যোতিদাদা, তিনি আমায় এমন প্রশ্রয় দিতেন যেন আমি তার সমবয়সী। মনে আছে তিনি

পিয়ানোর সুর বাজিয়ে যেতেন আর আমি মুখে মুখে গান বানিয়ে যেতুম। সেই সব দিনের মধ্যে জীবন যেন বাঁধা পড়ে আছে। কতই তো এল গেল, কিন্তু তেমন করে আর কিছু মনে পড়ে না। বৌঠাকরুনের পাখির সখ ছিল, এক চীনদেশের শ্যামা জোগাড় করেছিলেন,—একটা লোক ছাতু ফড়িং খাইয়ে যেত তাকে। আমার খাঁচায় পাখি বন্ধ করে রাখা ভালো লাগত না—তিনি আমার সে সব কথা উড়িয়ে দিতেন—'আর পাকামি করতে হবে না।'

১৩৪৬ আশ্বিন-কার্তিক

একবার এলাহাবাদে সত্যর ঘরে পুরোনো জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছবিখানি পেলুম, হঠাৎ ছবিখানা দেখে মনে হল, কী আশ্চর্য! এই কিছুদিন আগে যে আমাদের মাঝখানে এত সত্য হয়ে, জীবনে এতখানি হয়ে ছিল, আজ সে কত দূরে দাঁড়িয়ে আছে! আমাদের জীবন ছুটে চলেছে, কিন্তু সে থেমে গেছে ঐখানে। কতটুকু বা আর তাকে মনে পড়ে? কিন্তু তবু····তোমারে কি গিয়েছিনু ভুলে? ভুলেছি বটে, কিন্তু সে ভোলা কীরকম? তুমি আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হয়ে আছ বলেই সর্বদা তোমাকে মনে করতে হয় না। যেমন আমাদের যে চোখ আছে, সে কথা কি আমরা সর্বদা মনে করি····যে আমাদের চোখ আছে, চোখ আছে? তবু চোখ আছে বলেই তো আমরা দেখতে পাই। তেমনি সর্বদা মনে করিনে বটে যে তুমি ছিলে,—কিন্তু জীবনের মূলে তুমি আছ বলেই, তুমি একদিন এসেছিলে বলেই আমার ভুবন এত আনন্দময়, আমার জীবনে এত মাধুর্য।

১৩৪৭ ভাদ্র

····শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের; বাড়িতে

আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদিদির আমসত্ত্ব-পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। কখনো কখনো আমার উপর ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।....

....

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর-কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি ( ছোড়দিদি, বর্ণকুমারী ) বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা-বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা ক্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বৌঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও

ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, সেই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা কোনো দামী জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।' তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে। কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো-ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।....

....

....ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশকরা বৌবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা

রূপার রেকাবিতে বেল-ফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক-গ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে এক-খানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।

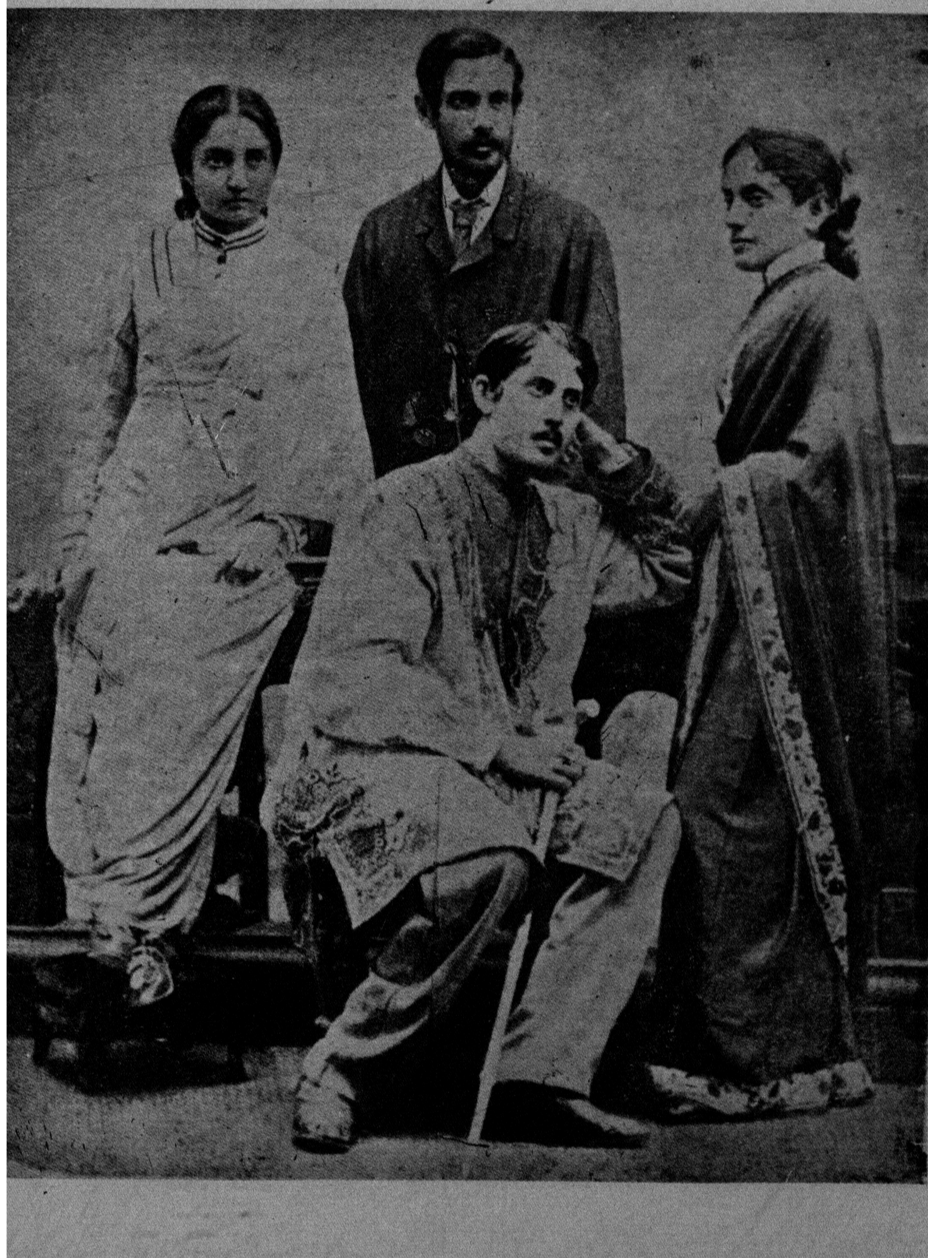
ছাদটা বৌঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।....

...

....জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বৌঠাকরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না। একে ঠিক জবাব বলা চলে না কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হল না, সে কথা বলছি।

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে, বলত 'এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন।' ঐ





মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারি নে। বারবার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি, জবাবে শুনেছি জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রঙকরা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের সেলাই-করা ঢাকনি-পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বারবার হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবা খেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।....

....

....মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন; আত্মীয়রা বললেন, ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উল্টো! কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম, তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক

টাট্টু ঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে। সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি নি! কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।....

....

....জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন, শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন, তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন কি সেতারে এসরাজেও তার চড়াই নি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বৌঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই। জ্যোতিদাদা তাঁর তেতালার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।

....

এইবার তেতলা ঘরের আর এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।....

একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা—কখনো এখানে, কখনো ওখানে। বৌঠাকরুন এলেন ছাদের ঘরে, বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত—কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষ'য়ে ছাদটা উঠত তেতে।

ত্বপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু-কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা-করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা-ত্বটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে; সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় ত্বপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না; কেননা আমার একটা গুণ ছিল, আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালো-বাসতেন। তখন বিজলি পাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

....

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার

তখনো জাত খোওয়ায় নি। মুষড়ে যায় নি তার দুই ধারে পাখির বাসা, আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁসে দেয় নি কালো নিশ্বাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালেপালায়, ডিঙিনৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ-ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বৌঠাকরুন ফিরে এলেন; গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো। যা-তা তর্ক নিয়ে কথা-কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উঁচুনিচু ঘর, মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারির সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছতলায়। সে রান্নায় মশলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল তেতালার বসতি, আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।....

১৩৪৭ ভাদ্র

একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে।
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ফ্যাকাসে চেহারা।
বাড়িতে এলো নতুন বউ,
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢলঢল।
কাঁচা-শামলা রঙের হাতে সরু সোনার চুড়ি।
মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
ফুঁ-ফাঁক হয়ে গেল জাদুমন্ত্রে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা।
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা,
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়।
ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে।

ও দিকে থাকে অভাবনীয়, এ দিকে থাকে উপেক্ষিত!
রাত হয়ে আসে।
স্বরূপসর্দার হাঁক দিয়ে যায়।
ছেঁড়া শেলাই-করা দড়িতে-ঝোলানো মশারি;
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে
গোধূলিলগ্নের সিঁদুরি রঙে,
চেলির রাঙা অন্ধকারে।

১৩৪৮ বৈশাখ

আমাদের কালে মেয়ে বলে যেন কিছুই ছিল না। মেয়ে বলে যে কিছু আছে জগতে তা বুঝতেই পারতুম না। এক রকম ছিলুম মন্দ না। এক যা বৌঠানের একটু আদরযত্ন পেয়েছি; ঐ একটি মেয়ের ভিতর দিয়েই মেয়েজাতকে চিনেছিলুম। তখন মেয়েরা এমনি দুর্লভ বস্তু ছিল। কিন্তু এখনো দেখছি—মেয়ে নেই। মেয়েরা গেল কোথায়।

১৩৪৮ আষাঢ়

এত অনাদরে মানুষ হয়েছি, কেউ দেখত না আমাদের। ভালোই এক হিসাবে। সবপ্রথম বড়দি—তার পরেই নতুন বৌঠান আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেই প্রথম আমি যেন জীবনে আদরযত্ন পেলুম। এত দুর্মূল্য সেটা লেগেছিল তা বলতে পারি নে। এত ভালোবাসা তাঁরা দিয়েছিলেন—এত প্রচুর পরিমাণে। এক হিসাবে আমাকে মাটি করেছেন; পড়াশুনা করতুম না, দেখ্-না, চিরকাল কেমন তাই মুখ্য হয়েই রইলুম। মনে পড়ে নতুন বৌঠান দুপুর বেলা বালিশে চুল এলিয়ে দিয়ে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' পড়তেন—

মাঝে মাঝে আমিও পাশে বসে পড়ে শোনাতুম তাঁকে। কোথায় গেল সেসব দিন।

মাকে আমরা বেশি পাই নি। আমার বড়দিই আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মার ঝোঁক ছিল জ্যোতিদা আর বড়দার উপরেই। আমি ছিলাম তাঁর কালো ছেলে! বড়দি কিন্তু বলতেন—যা-ই বলো রবির মতো কেউ না। বড়দির পর আমাকে হাতে নিলেন নতুন বৌঠান।

মেয়েরা যে কত স্নেহ ঢেলে দিতে পারে সেই দেখলুম যখন নতুন বৌঠান আমাকে হাতে নিলেন। আমি তো বাড়ির কালো ছেলে, সেই কালো ছেলেকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, এখন তা বুঝতে পারি। স্কুল থেকে ফিরে আসতুম, ঘরের দরজার পাশে চটিজুতো জোড়া, বুঝতুম তিনি রেখে দিয়ে গেছেন যত্ন করে। কত রকম রান্না করে এনে আমাকে খাওয়াতেন। একদিন কী হয়েছিল—অভিমান হয়েছিল আমার, আমি কোথায় দৌড় দিলুম। খুঁজেপেতে এনে আদর করে অভিমান ভাঙালেন। কত আদর। তাঁর মধ্যে যেন গভীর ভালোবাসার একটা উৎস ছিল। অথচ আমার কিছু প্রশংসা করা সেটা যেন ঠিক নয়। আমার কাব্য—তার চেয়ে বেহারী চক্রবর্তীর কাব্য ভালো। আমার গলা—তার চেয়ে সোমদা'র গলা, সে অনেক ভালো; শোনো কথা একবার। আর দেখতে আমাকে—এমনই বা কী। বড়ো দুঃখ হত, আয়নার সামনে গিয়ে ভাবতুম কোন্‌খানে সংশোধন করলে ভালো হয়।

ঝগড়া নিয়তই হত, চাবি চুরি করা আমার রোগ ছিল। যখন পেরে উঠতুম না চাবি চুরি করতুম তাঁর। সমস্ত তেতলার ছাদে খোঁজ চলত —কোথায় চাবি, কোথায় চাবি। সেই তেতলার ছাদটা যেমন ভালো লাগত, এমন বড়ো তেতলার লাগত না। সেটা তো অন্তঃপুরের তেতলার ছাদ। ওই একটা সিঁড়ি, একটা ঘর, বেশি তো ভড়ং ছিল না। একটা কাঠের ঘর ছিল, সেইখানেই তরকারি

বানানো হত—আর একখানি ঘর সেখানাই তাঁর বসবার, শোবার। সেই ছাদখানিই আমার খুব প্রিয় ছিল আর কি। সে-রকম তেতলার ছাদ আর হবে না, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দেখতুম, আকাশে মেঘ করে আসত, আমার চিরকালের আনন্দ। এক-একদিন আবার পুতুলের বিয়েতে ভোজ হত। সে রীতিমত খাওয়ানো। নতুন বৌঠান বলতেন—রবি ঠিক ওনার মতো করে খায়। তা খাব না তো কী বল্। কী রকম ছেলেমানুষ ছিলুম তোরা বুঝতেই পারবি না। এখনকার কালের সঙ্গে কত তফাত।

# অন্যান্যদের রচনা ও স্মৃতিকথা

# বিহারীলাল চক্রবর্তী

[ কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম—'সাধের আসন'। 'সাধের আসনে' অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া 'সারদামঙ্গল' হইতে এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—

"হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?"

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমির উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি এবং বাটীতে আসিয়া তিনটি শ্লোক লিখি। কিছুদিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল—'সাধের আসন'। ]

## নবম সর্গ

# আসনদাত্রী দেবী

### গীতি

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালী

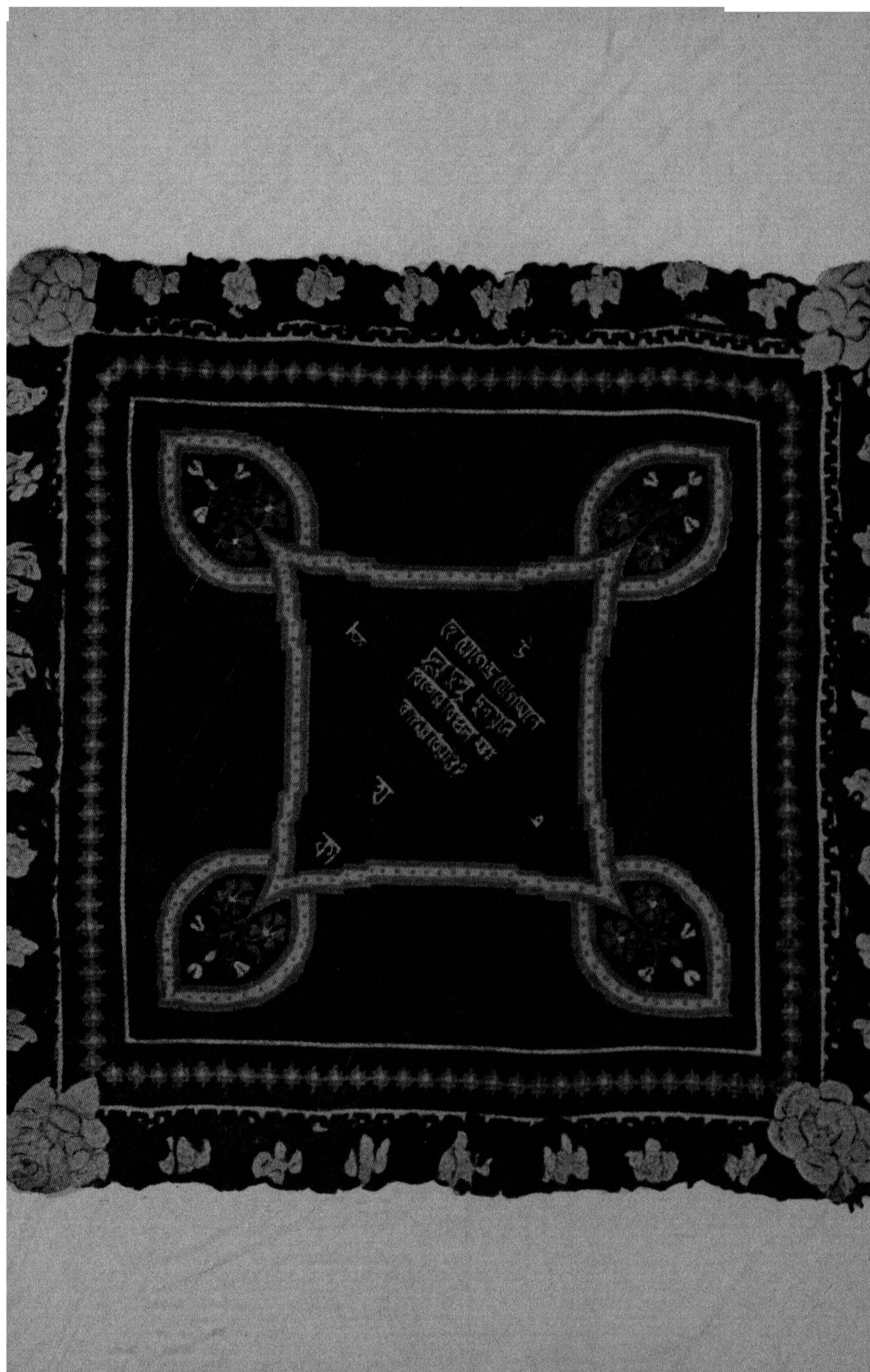
প্রাণ কেন এমন করে, ( আমার )
কি হ'ল কি হ'ল রে অন্তরে !
ভ্রমি ত্রিভুবন মন
করে কার অন্বেষণ
কাতর নয়ন কার তরে ?
ত্যজি এই মর্ত্যভূমি,
কোথা চ'লে গেলে তুমি
কি জানি কি—অভিমান ভরে !

১

তোমার আসনখানি
আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন কোরে, চিরদিন রাখিব ;
এ জীবনে আমি আর
তোমার সে সদাচার,
সেই স্নেহ-মাখা মুখ পশারিতে নারিব।

২

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল, যেন ম'রে গিয়েছে !
বে-সুরা বীণার মত





জানি না কি দশা হ'ত।
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে।

৩

সাহিত্য-সংসারে তুমি
সুকুমার ফুলভূমি,
তোমার স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে ;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগ-সমীরে কিবে করিতেছে ঢুল্ ঢুল্ !

৪

তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎপারা,
কতই বোবার মুখে কত কথা ফুটেছে,
কতই পরমানন্দে,
কত মত ছন্দবন্ধে,
কত ভাব ভঙ্গিমায়,
ইংরাজী ফরাসী কত বাঙ্গালায় বলেছে।

৫

চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কি বিষণ্ণ বঙ্গভূমি ;
সে অবধি আজো কেন
দেশে কি হয়েছে যেন !
নিকুঞ্জ-কাননে আর কোন পাখী ডাকে না !
ভাগীরথী-তীর থেকে আর বাঁশী বাজে না !
মানস-সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না !

স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না!
এ দেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না!

৬

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা পাখী, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে!
কি যেন কি হারায়েছে!
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন?

৭

কবে কার আবির্ভাবে,
থাকে যে কি এক ভাবে,
অভাবে সে ভাবে আর সেই সব থাকে না;
দোলায়ে ফুলের বন
চোলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে হায়, সে সৌরভ আসে না!

৮

কে গায় কাতর গান,
কেন শোকাকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর কেন কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণী?
আজি কি বিজয়া এল,
তিন দিন কোথা গেল?
কেন মা আনন্দময়ী, কাঁদো-কাঁদো মুখখানি?

৯

সুখের স্বপন কেন
চকিত ফুরায় যেন,
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওয়া যায়!
রয়েছে স্বজনগণে
যে যার আপন মনে,
নির্জনে বাতাস শুধু কোরে ওঠে 'হায়! হায়!'

১০

হা দেবী! কোথায় তুমি
গেছ ফেলে মর্ত্যভূমি?
সোনার প্রতিমা জলে কে দিল রে বিসর্জন?
কারো বাজিল না মনে,
বজ্রাঘাত ফুল্ল বনে!
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ?

১১

ওই যে সুন্দর শশী,
আলো কোরে আছে বসি!
চিরদিন হিমালয়,
কি সুন্দর জেগে রয়!
সুন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলস্বনে;
সুন্দর মানব কেন,
গোলাপ-কুসুম যেন—
ঝ'রে যায়, ম'রে যায় অতি অল্পক্ষণে!

১২

ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,

মধুর সুন্দর মূর্তি ত্রিদিব ললনা ;
ভোরে ভোরে আসে, যায়,
কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় কোমল কুসুমদলে
নির্মল দুয়েক ফোঁটা শিশিরাশ্রুকণা !

১৩

আহা, সেই স্বর্গের নিবাসী
চ'লে গেছে !
রেখে গেছে—
সুহৃদ্ জনের মনে
যাবার সময় সেই প্রাণ-ফাটা বিষাদের হাসি !

১৪

সেই মুখখানি মনে
কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
করুণ নয়নে দুটি সদাই প্রাণেতে ভায় ?
হা দেবী ! তোমায় আর দেখিব না এ ধরায় !

১৫

অমরার পদ্ম-পথে
পারিজাত-পুষ্পরথে
কিরণ-কলিত-মূর্তি তোমারই মহাপ্রাণী
অপরূপ রূপ ধরি,
যেতেছিল আলো করি ;
চেনো চেনো কোরেছিনু, চিনিতে পারিনে রাণী !

১৬

কেঁদে উঠেছিল প্রাণ,
মনে এসেছিল ধ্যান,

বুক ফেটে বারবার
উঠেছিল হাহাকার ;
উঠিল বাতাস ভোরে কি যেন আকাশবাণী—
তবুও—তবুও আহা নারিনু চিনিতে রাণী !

১৭

তুমিও আমায় দেখে
চেয়ে ছিলে থেকে থেকে,
চখে গড়াইল জল,
মুখখানি ছলছল !
কেন গো কি পেলে ব্যথা ?
কি জন্যে ক'লে না কথা ?
বুঝি বা আমারি মত
স্মরি স্মরি অবিরত,
এই পরিচিত জনে
পড়ে, পড়িল না মনে
পুষ্পরথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না ?
সেই দেখা, শেষ দেখা ; কিছু ব'লে গেলে না !

১৮

সকলি পড়িছে মনে,
যেন সেই পদ্ম-বনে
যোগেন্দ্রবালার কাছে
যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায় ;
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায় !

১৯

সকল সত্তার প্রাণ,
সুমধুর ঐকতান ;
সুরপুরে একত্তরে কি মধুর বাজিছে !
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে !
সে সব সত্তার মাঝে দেখেছি আমি তোমায়-
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায় !

২০

আহা সে রূপের ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি !
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
হৃদয়-উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন !

## দশম সর্গ

## পতিব্রতা

### গীতি

ললিত-কাওয়ালী

অহহ ! সম্মুখে সুমঙ্গল এ কি !
দেবি, দাঁড়াও, নয়ন ভোরে দেখি !
ত্যজেছ মানব-কায়া,
আজো ত্যজ নাই মায়া !
এ কি অপরূপ ছায়া—এ কি !
করুণ নয়ন দুটি
তেমনি রয়েছে ফুটি,

তেমনি চাঁচর কেশ, বেশ ;
মলিন—মলিন মুখ,
কেন গো কিসের দুখ ?
ভালবাসা মরণে মরে কি ?

১

সতীর প্রেমের প্রাণ,
পতি-প্রতি একটান ;
অমর: সে ভালবাসা, মরণেও মরে না।
স্বর্গ থেকে এসে, তাকে
অলক্ষ্যে আগুলে থাকে,
সে দেখে নয়ন ভোরে, কেহ তারে দেখে না।

২

শোকে কেঁদে উভরায়
পতি যদি ডাকে তায়,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়,
কি যেন নিঃসরে বাণী বহমান পবনে ;
না জানি কি শক্তি-বলে
সতীত্ব-তপের ফলে
আকাশে প্রকাশে আসি স্নেহ-মাখা আননে !

৩

কিবে শান্তিময় মুখ—
হেরে দূরে যায় দুখ,
প্রফুল্ল কপোল বহি গড়ায় নয়ন জল !
যত সাধ ছিল মনে,
পূর্ণ সেই শুভক্ষণে ;
বিয়োগ-কাতর-প্রাণ করুণায় সুশীতল।

৪

সে অবধি স্বপ্ন-প্রায়
সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করুণাছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে,
চারিদিকে মৃদুমন্দ
অপূর্ব ফুলের গন্ধ,
করুণ নয়ন দুটি মুখ-পানে চেয়ে আছে।

৫

স্বর্গ সর্বসুখময়
সতীদের পিত্রালয়,
সে আদরে তত স্নেহে তবুও টেঁকে না মন,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
কার মুখ পড়ে মনে,
কার তরে পাগলিনী! ধরাতলে বিচরণ?

৬

"মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ!"

অহহ পবিত্র ভাষা!
কি উদাত্ত ভালবাসা!
কে দিল উত্তর? আহা, কোন্ দেবী নাহি জানি!
এ যে রামায়ণ-কথা
সে যে সীতা স্বর্ণলতা,
কন্যা কবি বাল্মীকির,
পতি তাঁর রঘুবীর,

এ শ্লোক সীতার মুখে
শুনেছি মনের সুখে।
আজি সেই শ্লোকগান
কেন চমকায় প্রাণ ?
কথা কয় বাতাসে কি ?
এ কি, এ কি, এ কি দেখি !
আধ আধ বিভাসিত কার্ এ প্রতিমাখানি—
আকাশে সুন্দরী শ্যামা কার্ এ প্রতিমাখানি ?

৭

তুমি প্রভাতের ঊষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো !
কেন মা পৃথিবী আসি
শুকায় সুখের হাসি।
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা,
কই তোর প্রফুল্লতা ?
কে ছিঁড়েছে আশালতা ? কি মানে মানিনী গো ?

৮

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণ-মুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল ?
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে ;
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল ?

৯

এস না ধরায়—আর, এস না ধরায়!
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।
মনঃ প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন!
পশুর মতন এরা নিতুই নূতন চায়।
এস না ধরায়।

১০

গোলাপ ফুলের চেয়ে
সুন্দর, যুবতী মেয়ে,
মনের উল্লাসে হাসে প্রফুল্ল-নলিনী;
সেই পুণ্য-প্রতিমায়
আহা কি সৌন্দর্য ভায়!
জুড়াতে মানব-হৃদি
কি নিধি দিয়েছে বিধি!
পরম আনন্দ ভরে
পুণ্যাত্মা দর্শন করে;
কুরসিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি!

১১

সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ক-কালো উড়িয়া বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রবে ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,

ও নহে কাহারো পতি ;
কেন গো দাঁড়ায়ে সতি !
যাও মা আমরাবতী, এস না ধরায় !—
আর এস না ধরায় !

১২

দুর্বহ প্রেমের ভার,
যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে
মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ
জগৎ-জুড়ানো হাসি ;
প্রাণের অমৃতরাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে !

## জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

'····মেজদাদা ( সত্যেন্দ্রনাথ ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য "কিঞ্চিৎ জলযোগের" দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।

স্ত্রীস্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম

যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সে সব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় উন্মত্ত! এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা ত উঠাইলামই, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল!'

## শরৎকুমারী চৌধুরানী

'....ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন যখন ছিঁড়িল ভারতীর সেবকরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, ভারতী ধূলায় মলিন!....'

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'....সন্ধ্যেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোট অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোট হ'লেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার

ছিল। নতুন কাকিমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।'

## ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

স্বর্ণপিসিমার গীতিনাট্য 'বসন্ত-উৎসবে'র ( প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ ) সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান 'ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনীফুল' এখনো কানে বাজে।

অন্য গানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।....

ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিমা বসে গাইছেন, তাঁর বড়ো বড়ো চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। জ্যোতিকাকা আর রবিকাকা দুজনে মিলে টিনের তলোয়ার নিয়ে এই গানটি গেয়ে যুদ্ধ করেছিলেন—

কিরণ। লও এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকে কি অটল।
কিরণ। মূঢ় হ রে সাবধান!
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরান।

# নির্দেশিকা

## রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গপত্র

• 'উপহার' ভারতীতে ১২৮৭ কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয় 'ভগ্নহৃদয়' গীতি-কাব্যের উৎসর্গপত্ররূপে।

উপহার/২ 'ভগ্নহৃদয়' যখন গ্রন্থাকারে বেরুলো তখন 'শ্রীমতী হে—'র উদ্দেশে 'উপহার' এই নতুন কবিতা উৎসর্গপত্রে রচনা করেছিলেন।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র শেষ কবিতা 'উপহার'। কবিতাটি গ্রন্থের উৎসর্গপত্র। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রথম ১২৮৮ সালে প্রকাশিত।

'ছবি ও গান' ১২৯০ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' ১২৯০ সালে প্রকাশিত। 'সমাপন' রচনার অংশ।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ১২৯১ সালে প্রকাশিত।

'শৈশবসংগীত' ১২৯১ সালে প্রকাশিত।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ১২৯১ সালে প্রকাশিত।

## রচনা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯১ চৈত্র | 'আকুল আহ্বান' পুষ্পাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপি।

১২৯১ চৈত্র | 'পুরাতন', ভারতী। 'কড়ি ও কোমল' থেকে গৃহীত।

১২৯১ চৈত্র | 'শান্তি', পুষ্পাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপি। পরে পরিবর্তিত আকারে প্রথম প্রকাশ, ভারতী। পুষ্পাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

১২৯২ বৈশাখ | 'পুষ্পাঞ্জলি', ভারতী।

১২৯২ বৈশাখ | 'কেহ কারো মন বুঝে না', পুষ্পাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপি। পরে গীতবিতানে। গীতবিতান থেকে গৃহীত।

১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক | 'রুদ্ধ গৃহ', বালক।

১৩১৩ শ্রাবণ | অবলা বসুর কাছে লেখা চিঠি। ১৯ জুলাই, ১৯০৬। 'চিঠিপত্র' ৬। পৃ ৮৬।

১৩১৮ ভাদ্র/১৩১৯ শ্রাবণ | 'জীবনস্মৃতি', প্রবাসী।

১৩২১ অগ্রহায়ণ | 'ছবি', সবুজপত্র। '১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বা ১৩২১ শ্রাবণে য়ুরোপে বিশ্বযুদ্ধ বাধল। পূজাবকাশে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কবি বের হলেন ভ্রমণে গয়ায়, গয়া থেকে উত্তরভারতের নানাস্থলে। এই ঘোরাঘুরির মধ্যেই একসময় গঙ্গা-যমুনা-সংগমে প্রয়াগে বা এলাহাবাদে এসে পৌঁছলেন। কবির বাল্যসহচর ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি তাঁরই জামাতা প্যারী-মোহনের বাড়ীতে ছিলেন বোধকরি সপ্তাহ-তিন। সে বাড়ীতে স্বর্গীয়া নতুনবৌঠানের একখানি প্রতিকৃতি ছিল। তারই রহস্যময় নির্বাক্ দৃষ্টি কবির অন্তরতম অন্তরে প্রবেশ ক'রে কী প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল, বর্তমানভোলা কিশোর-কবিকে কী কথা বলল, তারই প্রতি প্রশ্নে আর প্রত্যুত্তরেও বটে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—'...তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা ?....' 'রবীন্দ্র-কাব্যের নেপথ্যবর্তিনী'/কানাই সামন্ত, রবীন্দ্রপ্রতিভা। পৃ ১৭৫।

'নতুনবৌঠানের একখানি প্রতিকৃতি ছিল', তারই উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা ? এ তথ্য যেমন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশের লেখায় জানা যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীর মুখেও শোনা। আমাদের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না, অন্যেও যাতে নিঃসংশয় হতে পারেন এজন্য সম্প্রতি তাঁকে চিঠি লিখে এই

পাওয়া গেছে—I had once asked Gurudev directly as to whether the poem "Chhabi" in Balaka was inspired by Mrinalini Devi's Portrait. He replied, "No, the poem was addressed to Notun Bouthan's Photograph." 8th June, 1961.

K. R. Kripalani. 'জ্ঞাতব্যপঞ্জী'/কানাই সামন্ত। রবীন্দ্র-প্রতিভা। পৃ ৩৯৭।

১৩২৪ আষাঢ় | অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, 'কবিতা', ১৩৪৮ কার্তিক।

১৩২৬ আষাঢ় | 'কথিকা', সবুজপত্র। পরে 'প্রথম শোক', লিপিকা।

১৩২৬ কার্তিক/১ | 'কৃতঘ্ন শোক', ভারতী।

১৩২৬ কার্তিক/২ | 'সতেরো বছর', ভারতী।

১৩৩৬ কার্তিক-অগ্রহায়ণ/প্লানচেট | রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত 'ভৌতিক প্রসঙ্গ', খাতার অংশ। কাদম্বরী দেবীর আঁকা রবীন্দ্রনাথের কাছে আসে ৪, ২৮, ২৯ নভেম্বর। ৪ তারিখের কোনো লিপিবদ্ধ বিবরণ নেই। প্রথম মুদ্রণ, শারদীয় আনন্দবাজার, ১৩৮০। পরে অমিতাভ চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' গ্রন্থে।

'প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেছে বুলার পেন্সিল দিয়ে যে লেখাগুলো বেরোয় বিশেষ করে তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এ-সব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপন সম্বন্ধে যাকে ফ্যাক্‌ট্‌স্‌ বলা যায় তাই দিয়ে যদি তুমি পরীক্ষা করো তবে প্রমাণ হবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই। যে গান নিজে রচনা করেছি পরীক্ষা দিতে গেলে তার কথাও মনে পড়বে না, তার সুরও না।...' 'ইতিমধ্যে পরশু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তার পরে যে সব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোনো-এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাব।....'

রাণী মহালনবিশের কাছে লেখা চিঠি। ১০ নভেম্বর, ১৯২২।
'পথে ও পথের প্রান্তে'। পৃ ৯৯।

১৩৩১ শ্রাবণ | আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ।

১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ | গুরুদেব, রানী চন্দ।

১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ।

১৩৪৪ আষাঢ় | ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ।

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী।

১৩৪৬ আশ্বিন-কার্তিক | মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী।

১৩৪৬ আশ্বিন-কার্তিক | মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী।

১৩৪৭ ভাদ্র | ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ।

১৩৪৭ ভাদ্র | 'ছেলেবেলা'র পাণ্ডুলিপি 'বাল্যদশা' কবিতার 'একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে' থেকে কবিতাটির শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ 'বধূ' নামে আলাদা কবিতা বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৩৪৮ বৈশাখ | আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ।

১৩৪৮ আষাঢ় | আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ।

অন্যান্য

বিহারীলাল চক্রবর্তী

সাধের আসনের উৎসর্গপত্র।

সাধের আসন, নবম দশম সর্গ, ১২৯৬।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

ভারতীর ভিটা, ভারতী ১৩২৩। পরে বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আবহাওয়া', শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

'রবীন্দ্রস্মৃতি', ১৩৬৭ বৈশাখ।

বংশলতিকা

জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়    শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্যামলাল—ত্রৈলোক্যসুন্দরী

রদা    মনোরমা    কাদম্বরী    শ্বেতাম্বরী